রাজবাড়ির রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রাজবাড়ির রহস্য

টুক করে একটা শব্দ হতেই শৈবাল দত্তর ঘুম ভেঙে গেল। এত সহজে তাঁর ঘুম ভাঙে না। শব্দটা ঠিক যেন কোনও ঘরের ছিটকিনি খোলার শব্দের মতন। তিনি বেডসাইড টেব্‌লের ঘড়িটা দেখলেন। অন্ধকারে ঘড়ির কাঁটাগুলো জ্বলজ্বল করছে, এখন রাত দুটো বেজে কুড়ি মিনিট।

গতকাল রাতেও প্রায় এই সময়েই একটা গণ্ডগোলে তাঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সিঁড়ির কাছে একটা জোর শব্দ হয়েছিল হুড়মুড় করে। শৈবাল ছুটে গিয়ে দেখেছিলেন, দোতলা থেকে একতলায় নামার সিঁড়ির মাঝখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে দেবলীনা।

কেওনঝড়ে একটা পুরনো রাজবাড়িতে মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন শৈবাল দত্ত। দেবলীনার সঙ্গে তার বান্ধবী শর্মিলাও এসেছে। মস্ত বড় প্রাসাদ, অনেক ঘরই ফাঁকা পড়ে আছে। পাশাপাশি দু'খানা ঘর নিয়েছেন ওঁরা। শর্মিলাকে না ডেকে অত রাতে একা-একা বাইরে বেরিয়েছিল কেন দেবলীনা? বাথরুমটা একেবারে পাশেই। তবু টানা লম্বা বারান্দা অনেকখানি হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে গিয়েছিল কেন সে?

দেবলীনার মুখে খানিকটা জলের ছিটে দিতেই তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল কিন্তু সে বাবার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। শৈবাল দত্ত বারবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুই নীচে নামছিলি কেন, কোথায় যাচ্ছিলি?" দেবলীনা মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ বুজে বলেছিল, "জানি না। জানি না!"

শর্মিলার ঘুম খুব গাঢ়। সে এসব কিছু টেরই পায়নি। শৈবাল মেয়েকে ধরে-ধরে নিয়ে আবার শুইয়ে দিয়েছিলেন বিছানায়। কিন্তু তাঁর মনে একটা খটকা লেগেছিল, ব্যাপারটা খুব সাধারণ নয়।

আজ সকালে দেবলীনা আবার খুব হাসিখুশি। এ-বাড়ির একজন বুড়ো দরোয়ানকে নিয়ে ওরা দুই বান্ধবী জঙ্গলে বেড়াতে গেল। দুপুরবেলা ফিরে এসে দেবলীনা মহা উৎসাহে বাবাকে গল্প শোনাল যে, ওরা জলার পাশে হাতির পায়ের ছাপ দেখেছে! দেবলীনার মুখ দেখলে মনে হয়, যেন কাল রাত্তিরের

ঘটনা তার মনেই নেই।

আজ রাতেও ছিটকিনি খোলার শব্দ শুনেই শৈবালের কীরকম যেন সন্দেহ হল। তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে তিনি প্রায় নিঃশব্দে নিজের ঘরের দরজা খুলে তাকালেন বাইরে। ঢাকা বারান্দাটায় কোনও আলো জ্বলছে না, তবে বেশ জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। সাদা একটা ফ্রক পরে হেঁটে যাচ্ছে দেবলীনা। সে খুব জোরেও যাচ্ছে না, আস্তেও না, সে যেন পা মেপে-মেপে হাঁটছে। মুখখানা একেবারে সামনের দিকে সোজা।

বুকখানা একবার ধক করে উঠল শৈবালের। এ কি তাঁর মেয়ে দেবলীনা, না অন্য কেউ? এরকম চুপিচুপি সে কোথায় যাচ্ছে? সে কি ঘুমের মধ্যে হাঁটছে? স্লিপ-ওয়াকার?

চটি না পরেই বেরিয়ে এলেন শৈবাল, পা টিপে-টিপে অনুসরণ করতে লাগলেন মেয়েকে। স্লিপ-ওয়াকারদের হঠাৎ ডেকে চমকে দিতে নেই। দেখাই যাক না ও কোথায় যায়। শৈবাল একবার ভাবলেন, ফিরে গিয়ে তাঁর রিভলভারটা নিয়ে আসবেন কি না! শর্মিলা একা রইল। সে আবার হঠাৎ জেগে উঠে ভয় পেয়ে যাবে না তো? কিন্তু দেবলীনা ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছে। দেরি করলে যদি ও হারিয়ে যায়?

আজ দেবলীনা বেশ এক-পা এক-পা করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। একতলায় একটা গোল উঠোন, তারপর লোহার গেট। একতলায় কয়েকজন কর্মচারী থাকে, তারা সবাই এখন ঘুমন্ত। গেটে দরোয়ানের পাহারা দেবার কথা, কিন্তু সেখানে কেউ নেই, তবে গেটে একটা প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে।

দেবলীনা সেই গেটের সামনে গিয়ে তালাটায় একবার হাত বুলোল। তারপর বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। আগেকার দিনের এই সব বড় গেটের মধ্যে আবার একটা ছোট গেট থাকে, সেটাতে শুধু ছিটকিনি দেওয়া তালা নেই। সেই ছোট গেটটা খুলে দেবলীনা বাইরে বেরিয়ে গেল।

একতলার বারান্দা থেকে দৌড়ে এলেন শৈবাল। ছোট গেটটা দিয়ে মাথা বার করে দেখলেন, দেবলীনা এখন ছুটছে। শৈবালও বাইরে এসে ছুটতে লাগলেন।

এখানে এককালে একটা বাগান ছিল, এখন কেউ যত্ন করে না বলে ঝোপঝাড় হয়ে গেছে। বাগানের কাঠের গেটটা ভেঙে পড়ে গেছে অনেকদিন, কোনও বেড়াও নেই। মাঝখান দিয়ে একটা লাল সুরকির রাস্তা। একটুখানি পরেই সেই রাস্তাটা নেমে গেছে নীচের দিকে। এখানকার মাটি ঢেউ-খেলানো। দেবলীনাকে আর দেখা যাচ্ছে না। সে যেন মিলিয়ে গেছে জ্যোৎস্নায়।

বাগানের বাইরে লাল সুরকির রাস্তাটা বেঁকে গেছে ডান দিকে। এক পাশে একটা জঙ্গলের মতন। দেবলীনা কি রাস্তাটা ধরেই গেছে, না জঙ্গলের মধ্যে

ঢুকে পড়েছে, তা বুঝতে পারলেন না শৈবাল। কাল রাতে খুব কাছেই শেয়ালের ডাক শোনা গিয়েছিল। রাত্তিরের দিকে আরও কোনও জন্তু-জানোয়ার আসতে পারে। শৈবাল ভয় পেয়ে গেলেন। দেবলীনা কি জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ? ও গাছপালা খুব ভালবাসে।

শৈবালও জঙ্গলের মধ্যেই দেখতে এলেন আগে। এখানে জ্যোৎস্নার আলো পড়েনি ভাল করে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, টিপটিপ করছে কয়েকটা জোনাকি। সঙ্গে টর্চ নেই, কোনও অস্ত্র নেই, দেবলীনাকে এতদূর আসতে দেওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু গেট দিয়ে বেরিয়েই যে দেবলীনা ছুটতে আরম্ভ করবে, তা ভাবতে পারেননি শৈবাল। তার ধারণা ছিল, স্লিপ-ওয়াকাররা আস্তে-আস্তে হাঁটে, তারা দৌড়য় না।

শুকনো পাতার ওপর কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, সেইদিক লক্ষ্য করে খানিকটা এগিয়েও শৈবাল কাউকে দেখতে পেলেন না। এবারে তিনি দেবলীনার নাম ধরে ডাকতে যেতেই কার যেন কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন।

কয়েক মুহূর্ত তিনি থমকে দাঁড়িয়ে শব্দটা ভাল করে শুনলেন। প্রথমে কান্নার মতন মনে হলেও পরে গানের মতন শোনাল। গানের কোনও কথা নেই, শুধু একটা টানা সুর।

শৈবাল পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন। জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে একটা উঁচু ঢিবি। তার ওপরে হাঁটু গেড়ে বসেছে দেবলীনা। আঙুল দিয়ে কী যেন লিখছে মাটিতে, সে-ই গান গাইছে।

শৈবাল অপলকভাবে চেয়ে রইলেন সেদিকে। দৃশ্যটা খুবই সুন্দর, তবু গা-ছমছম করে। মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে এই জঙ্গলের মধ্যে একা-একা গান গাইছে কেন দেবলীনা ? এ কী মাথা-খারাপের লক্ষণ ?

হঠাৎ যেন একটা ঝড় উঠল। শোঁশোঁ আওয়াজ, গাছগুলো দুলতে লাগল, পাতা ঝরতে লাগল ঝাঁক-ঝাঁক। ঝড়ের শব্দটাও অন্যরকম, ঠিক যেন মানুষের গলায় প্রচণ্ড হাসির আওয়াজ।

দেবলীনার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে একইরকমভাবে বসে আছে।

শৈবাল চিৎকার করে ডাকলেন, "খুকি, খুকি !"

দেবলীনা কোনও সাড়া দিল না, পেছন ফিরে তাকাল না পর্যন্ত, হয়তো ঝড়ের আওয়াজের জন্য সে তার বাবার ডাক শুনতে পায়নি।

শৈবাল 'খুকি খুকি' বলে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে উঠতে লাগলেন ঢিবির ওপর। এখানে মাটির বদলে বালি বেশি, তাঁর পা পিছলে যেতে লাগল, তবু তিনি উপরে উঠে এসে দেবলীনার হাত ধরে বললেন, "অ্যাই খুকি, এখানে কী করছিস ?"

দেবলীনা খুব চমকে গিয়ে বলল, "কে ? আপনি কে ?"

শৈবাল বললেন, "খুকি, আমি তোর বাবা! ঝড় আসছে, শিগগির বাড়ি চল্।"

উঠে দাঁড়িয়ে এক ঝটকায় নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দেবলীনা একটা দৌড় লাগাল, দৌড়তে-দৌড়তে চিৎকার করতে লাগল, "না, না, না, না..."

শৈবাল তাকে ধরার চেষ্টা করেও ধরতে পারলেন না।

২

দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন কাকাবাবু, এমন সময় ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। এখন বম্বে থেকেও স্পষ্ট কথা শোনা যায়। কাকাবাবু ফোন তুলে বলেন, "ইয়েস, রাজা রায়চৌধুরী স্পিকিং...কে, বলবন্ত্ রাও?...হ্যাঁ, কী ব্যাপার বলো...সেই মিউজিয়ামে ডাকাতির ব্যাপারটা...হ্যাঁ, কাগজে পড়েছি, জানি,...না, না, আমি যেতে পারব না, আরে চোর-ডাকাত ধরা কি আমার কাজ নাকি?...হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনছি, তোমার কথা শুনছি...মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেছেন? শোনো বলবন্ত্, মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝিয়ে বলো, আমার শরীর খারাপ, এখন আমার পক্ষে বম্বে যাওয়া সম্ভব নয়।...হ্যাঁ সত্যিই আমি ক্লান্ত, এখন কোথাও যাব না..."

টেলিফোন রেখে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "উফ্, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। চোর ধরতে আমাকে বম্বে দৌড়তে হবে! আমি কি গোয়েন্দা নাকি?"

উপস্থিত দু'জন ভদ্রলোকের মধ্যে একজন বললেন, "কিন্তু মিঃ রায়চৌধুরী আমাদের বর্ধমানে একবার আপনাকে যেতেই হবে। বেশি তো দূরে নয়, আপনাকে গাড়িতে নিয়ে যাব, মহারাজার গেস্ট হাউসে থাকবেন, কোনও অসুবিধে হবে না, আগুন লাগার ব্যাপারটা আমরা কেউ কিছু বুঝতে পারছি না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে মাফ্ করতে হবে। এখন আমি কোথাও যেতে পারব না। এই তো দু'দিন আগে মধ্যপ্রদেশ থেকে ফিরেছি, একটা নীলমূর্তির জন্য সেখানে পাহাড়ে-জঙ্গলে এত ছোটাছুটি করতে হয়েছে...এখন কিছুদিন আমি বিশ্রাম চাই।"

অন্য ভদ্রলোকটি বললেন, "বর্ধমানে তো আপনার বিশ্রামই হবে। গেস্ট হাউসে থাকবেন কেউ আপনাকে ডিসটার্ব করবে না, শুধু রাত্তিরে যদি আগুনটা জ্বলে..."

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, "আমাকে সত্যিই ক্ষমা করুন। আমার শরীর-মন খুবই ক্লান্ত, এখন আমি কিছুদিন একা থাকতে চাই।"

এই সময় শৈবাল দত্ত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "কাকাবাবু, কেমন আছেন?"

কাকাবাবু খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "আরে শৈবাল, এসো, এসো ! কবে ফিরলে ?"

শৈবাল দত্ত এসে বসলেন কাকাবাবুর পাশের একটা চেয়ারে। ভদ্রলোক দু'জন কাকাবাবুকে বর্ধমানে নিয়ে যাবার জন্য ঝুলোঝুলি করলেন আরও কিছুক্ষণ। কাকাবাবু কিছুতেই যেতে রাজি হলেন না। নিরাশ হয়ে তাঁরা উঠতে বাধ্য হলেন।

ওঁরা বেরিয়ে যাবার পরই সন্তু এসে বলল, "কাকাবাবু, এইমাত্র তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে।"

হাত বাড়িয়ে কাকাবাবু টেলিগ্রামটা নিয়ে বললেন, "কে পাঠিয়েছে ? ও, নরেন্দ্র ভার্মা। সে আবার কী চায় ?...ইয়োর প্রেজেন্স ইজ আর্জেন্টলি নিডেড ইন ডেল্হি। কাম বাই দা ইভনিং ফ্লাইট টু-ডে ! টপ সিক্রেট !"

কাগজটা মুড়ে গোল্লা পাকাতে পাকাতে কাকাবাবু বললেন, "টপ সিক্রেটের নিকুচি করেছে ! কিছু একটা হলেই আমাকে দিল্লি যেতে হবে ? অসম্ভব, এখন অসম্ভব !"

সন্তু বলল, "দিল্লির থেকে বম্বে ভাল। আমি দিল্লিতে দু'বার গেছি, বম্বে যাইনি।"

কাকাবাবু ধমকের সুরে বললেন, "অ্যাই, সামনেই তোর পরীক্ষা না ? তোর এখন কোথাও যাওয়া চলবে না। আমিও যাব না। কী ব্যাপার বলো তো শৈবাল, সবাই মিলে আমাকে এত ডাকাডাকি শুরু করেছে কেন ? হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে গেলাম নাকি ?"

শৈবাল বললেন, "আপনি বিখ্যাত তো বটেই। গত মাসেই টাইমস অব ইন্ডিয়ায় একটা বড় লেখা বেরিয়েছে আপনাকে নিয়ে !"

"নিশ্চয়ই অনেক কিছু বানিয়ে বানিয়ে লিখেছে ! সন্তু, তুই টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে একটা উত্তর পাঠিয়ে দিয়ে আয় !"

"কী লিখব ?"

"শুধু লিখে দিবি, 'কাউন্ট মি আউট।' তার তলায় আমার নাম।"

শৈবাল বললেন, "টেলিগ্রাম না পাঠিয়ে দিল্লি থেকে উনি ফোন করলেই তো পারতেন। আপনিও ফোনে উত্তর দিতে পারতেন।"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই ফোনে লাইন পায়নি। একটু আগে আমি বম্বে থেকে একটা কল পেলাম। বম্বে-দিল্লি এইসব লাইনই একসঙ্গে ভাল থাকবে, এ-রকম কখনও হয় আমাদের দেশে ? যাকগে, ফোন করেনি ভালই হয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে ঝুলোঝুলি করত ! তোমার কথা বলো শৈবাল, কেমন বেড়িয়ে এলে ? কোথায় যেন গিয়েছিলে, ময়ূরভঞ্জ ?"

শৈবাল বললেন, "না, কেওনঝড়। আমার অফিসের এক কলিগের ওখানে একটা বাড়ি আছে। খুব নির্জন জায়গায় বাড়িটা, চুপচাপ বিশ্রাম নেবার পক্ষে

চমৎকার। আমার বন্ধুর ঠাকুর্দা কেওনঝড় নেটিভ স্টেটের দেওয়ান ছিলেন, এককালে ওই বাড়িটা রাজাদেরই ছিল। রাজারা ওখানে শিকার করতে যেতেন।"

"এখনও কিছু জন্তু-জানোয়ার আছে ওদিকে ?"

"হরিণ তো আছেই। লেপার্ড দেখা যায় মাঝে-মাঝে। শেয়ালের ডাক শুনেছি খুব। আজকাল তো এদিকে শেয়ালের ডাক শোনাই যায় না। পাখি আছে অনেকরকম। কত জাতের যে পাখি, নামই জানি না।"

"বাঃ, শুনে তো বেশ লোভ হচ্ছে। ইচ্ছে করছে ওখানে গিয়ে কাটিয়ে আসি কয়েকদিন। চোর-ডাকাত আর বদমাস লোকেদের পেছনে ছুটোছুটি করতে আর ভাল লাগে না, তার চেয়ে পাখি দেখা অনেক ভাল।"

"আপনি যাবেন ? যে-কোনও সময়ে ব্যবস্থা করে দিতে পারি। একটাই শুধু অসুবিধে, ওই বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই। সন্ধেবেলা হ্যাজাক জ্বালতে হয়।"

"সেটা এমন-কিছু অসুবিধের ব্যাপার নয়। দেবলীনা কেমন আছে ? ওকে নিয়ে এলে না কেন ? অনেকদিন দেখিনি ওকে !"

একটু চুপ করে গিয়ে শৈবাল একটা সিগারেট ধরাবার সময় নিলেন। কাকাবাবু তাঁর সামনে অন্য কারও সিগারেট টানা পছন্দ করেন না আজকাল, কিন্তু শৈবালের মনে থাকে না সে-কথা।

মুখ তুলে শৈবাল বললেন, "খুকি এল না...মানে, ওর একটু শরীর খারাপ।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে দেবলীনার ?"

"সে-রকম কিছু হয়নি, এমনিতে ভালই আছে, তবে...কাকাবাবু, আপনার সঙ্গে একটা ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই, আপনার হাতে কি একটু সময় আছে ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক সময় আছে। এখন তো কোনও কাজই নেই। দাঁড়াও, একটু কফি খাওয়া যাক।"

সন্তু একটু আগেই চলে গেছে এ-ঘর থেকে। এখন সে বাইরে যাবার পোশাক পরে দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে মুচকি হেসে বলল, "কাকাবাবু, তোমার কাছে আবার একজন লোক এসেছে।"

কাকাবাবু ভয় পাবার ভঙ্গি করে বললেন, "আবার লোক ? একটু নিরিবিলিতে গল্প করছি শৈবালের সঙ্গে। তুই কথা বলে দ্যাখ না লোকটি কী চায় ?"

সন্তু বলল, "লোকটি তোমার জন্য কী যেন একটা জিনিস নিয়ে এসেছে। সেটা সে নিজে তোমার হাতে দেবে।"

"তা হলে ডেকে নিয়ে আয় লোকটাকে !"

খাকি প্যান্ট-শার্ট পরা একজন লম্বা লোক ঢুকল, কোনও অফিসের দরোয়ান

বলে মনে হয়। হাতে বেশ বড় একটা চৌকো কাগজের বাক্স, রঙিন কাগজ দিয়ে মোড়া। সে সোজা কাকাবাবুর দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, "আপ রাজা রায়চৌধুরী? ইয়ে আপকে লিয়ে হ্যায়।"

খুব সাবধানে জিনিসটি টেবিলের ওপর রেখে লোকটি কাকাবাবুকে দিয়ে সই করাবার জন্য একটা রসিদ বার করল বুক-পকেট থেকে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কিসনে ভেজা?"

লোকটি বলল, "আর. কে. দত্তা সাহাব।"

কাকাবাবু রসিদটা ভাল করে পড়ে দেখলেন, তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল, তবু তিনি সই করে ফিরিয়ে দিলেন সেটা। লোকটি সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "কে পাঠিয়েছে কিছুই বোঝা গেল না। আর. কে. দত্ত যে কে, তা তো মনে পড়ছে না আমার। কিন্তু আমারই নাম-ঠিকানা লেখা। যাকগে!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওটা খুলে দেখবে না?"

কাকাবাবু চওড়াভাবে হেসে বললেন, "তোর বুঝি খুব কৌতূহল হচ্ছে? অনেক ডিটেকটিভ-গল্পের বইতে থাকে যে, কোনও রাজা-মহারাজার কেস সল্‌ভ করে দেবার পর তিনি এরকম একটা বিরাট কিছু উপহার পাঠান। আমি তো কোনও রাজা-মহারাজার কেস করিনি! আজকাল সে-রকম রাজা-মহারাজাই বা কোথায়? আর-একটা হয়, শত্রুপক্ষের কেউ এইরকম বেশ সুন্দর মোড়কে মুড়ে একটা টাইম বোমা পাঠিয়ে দেয়। খুলতে গেলেই মুখের উপর ফাটবে।"

শৈবাল বললেন, "আমারও বেশ কৌতূহল হচ্ছে। তবে, সত্যিই যদি টাইম বোমা হয়...আপনার শত্রুর তো অভাব নেই!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার তো কেউ শত্রু আছে বলে মনে পড়ে না!"

শৈবাল বললেন, "ওই লোকটাকে তক্ষুনি ছেড়ে না দিয়ে ওকে একটু জেরা করে দেখলে হত!"

কাকাবাবু বাক্সটা নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখলেন, কোনও শব্দ হল না। তিনি সন্তু ও শৈবালের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জয় মা কালী বলে খুলে ফেলা যাক, কী বলো? টাইম বোমার অনেক দাম, আমাকে মারবার জন্য কেউ অত টাকা খরচ করবে না।"

সুতোর বাঁধন টেনে ছিঁড়ে ফেললেন তিনি, তারপর বাক্সটার মুখ খুলে দেখলেন, ভেতরে অনেকটা তুলো। খুশি মনে কাকাবাবু বললেন, "মনে হচ্ছে কেউ একটা ঘড়ি বা দামি কাচের জিনিস পাঠিয়েছে।"

তুলোটা তুলতে গিয়ে কাকাবাবু থেমে গেলেন। মুখের হাসিটা মুছে গেল, কুঁচকে গেল ভুরু। বাক্সটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "না রে, কোনও দামি জিনিস আমার ভাগ্যে নেই। যে

পাঠিয়েছে, সে একটা ব্যাপার জানে না। আমার পা খোঁড়া কিন্তু আমার ঘ্রাণশক্তি সাঙ্ঘাতিক, অন্য অনেকের চেয়ে আমি চোখে বেশি দেখতে পাই, কানে বেশি শুনতে পাই। এমনকী, কেউ আমার সামনে মিথ্যে বললেও সেটা আমি ধরে ফেলতে পারি। এই বাক্সটায় আমি কোনও জ্যান্ত প্রাণীর গন্ধ পাচ্ছি!"

সঙ্গে-সঙ্গে শৈবাল আর সন্তু খানিকটা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, চট করে রান্না ঘরে গিয়ে বউদির কাছ থেকে একটা সাঁড়াশি চেয়ে আন তো!"

সন্তু দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

শৈবাল বললেন, "জ্যান্ত প্রাণী মানে...সাপ?"

"খুব সম্ভবত। যেমনভাবে প্যাক করা হয়েছে, অন্য কোনও প্রাণী বাঁচবে না।"

"কী ডেঞ্জারাস ব্যাপার! যদি হঠাৎ বেরিয়ে আসে?"

"সাধারণত সাপ তেড়ে এসে কাউকে কামড়ায় না। তবে তুলোর মধ্যে আমি হাত ঢোকালে বিপদের সম্ভাবনা ছিল।"

শুধু সাঁড়াশি নয়, সন্তু একটা লাঠিও নিয়ে এসেছে।

কাকাবাবু সাঁড়াশি দিয়ে বাক্সটা চেপে ধরে, এক বগলে ক্রাচ নিয়ে চলে এলেন বারান্দায়। বাক্সটা মেঝেতে উলটে দিয়ে কয়েকবার ঠুকে-ঠুকে তুলে নিলেন।

তুলোর মধ্যে সত্যিই একটা কুণ্ডলি-পাকানো সাপ। সেটা বেঁচে আছে ঠিকই, কিন্তু মানুষ দেখেও মাথা তুলল না, ফোঁস করল না, কয়েকবার চিড়িক-চিড়িক করে জিভ বার করল শুধু।

সন্তু দমাদম লাঠির বাড়ি মারতে লাগল সেটার ওপরে। কাকাবাবু হাত তুলে বাধা দিতে গিয়েও বললেন, "এটা তো আগেই প্রায় আধমরা হয়ে আছে, মেরে ফেলাই ভাল।"

রান্নাঘর থেকে আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে ছুটে এসে সন্তুর মা বললেন, "কী সাঙ্ঘাতিক কথা! একটা জ্যান্ত সাপ পাঠিয়েছে? যদি সন্তু আগেই এটা খুলে ফেলত?"

কাকাবাবু বললেন, "যে পাঠিয়েছে, সে আমাদের ঠিক মারবার জন্য পাঠায়নি, ভয় দেখাবার জন্য পাঠিয়েছে। একেই তো সাপটা নির্জীব, তাতে ওর বিষ আছে কি না সন্দেহ!"

মা চোখ কপালে তুলে বলবেন, "সাপকে কখনও বিশ্বাস আছে? এইটুকু পুঁচকে সাপেরও দারুণ বিষ থাকে। কে এমন সাঙ্ঘাতিক জিনিস পাঠাল?"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সেইটাই তো কথা বউদি! সে কি আর নিজের পরিচয় জানাবে? বাজে একটা নাম লিখে দিয়েছে। কিন্তু সে

তো একটা পাঠিয়েই থামবে না, আবার কিছু পাঠাবে ! তার পেছনে আমাকে দৌড়তে হবে, তাকে ধরতে হবে, শাস্তি দিতে হবে। একের পর এক ঝামেলা !”

মা বললেন, “রাজা, তুমি চোর-ডাকাতদের পেছনে ছোটা ছেড়ে দাও এবার !”

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, “তুমি ঠিক বলেছ বউদি ! এসব এবার ছেড়ে দেব ভাবছি। কিন্তু আমি ছাড়তে চাইলেও যে ওরা ছাড়তে চায় না !”

মা বললেন, “কেউ এলে তুমি আর দেখা কোরো না। শুধু-শুধু শত্রু বাড়িয়ে চলেছ ! এরপর হঠাৎ যে কোন্‌দিন কী হয়ে যাবে...”

সন্তু মরা সাপটাকে লাঠির ডগায় তুলে বলল, “এবার এটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। নইলে আবার বেঁচে উঠতে পারে !”

শৈবাল বললেন, “রাস্তায় ফেলে দাও বরং, গাড়ির চাকার তলায় একেবারে চেপ্টে যাবে !”

মা বললেন, “কী অলক্ষুণে ব্যাপার ! বাক্সতে ভরে যে সাপ পাঠায়, সে কতখানি অমানুষ !”

কাকাবাবু বললেন, “বউদি, আমাদের দু'কাপ কফি পাঠিয়ে দাও, শৈবালের সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে। সন্তু, তুই পড়তে বোস গিয়ে।”

সন্তু বলল, “আমি টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিয়ে আসছি !”

কাকাবাবু আবার শৈবালকে নিয়ে ঘরে এসে বসলেন। শৈবাল আবার ফস করে জ্বাললেন একটা সিগারেট। তারপর এক হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন, “আপনার এখানে এরকম প্রায়ই হয় বুঝি ? বাক্সটা খুলেই যদি হাত ঢুকিয়ে দিতেন ?”

কাকাবাবু হাল্‌কাভাবে বললেন, “চার্মড লাইফ কাকে বলে জানো নিশ্চয়ই ? আমার হচ্ছে সেইরকম, মৃত্যু সব সময় আমার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় ! যাকগে, আজকে এমন কিছু হয়নি। শোনো শৈবাল, তুমি কিন্তু আজ ঘন-ঘন সিগারেট খাচ্ছ !”

শৈবাল লজ্জা পেয়ে বললেন, “ওহ্, আই অ্যাম সরি। কাকাবাবু, ফেলে দিচ্ছি !”

“শোনো, ওটা ধরিয়েছ যখন, শেষ করতে পারো। ব্যাপার কী জানো, আমি তো চুরুট খেতাম, এখন ছেড়ে দিয়েছি বটে, কিন্তু এখনও তামাকের ধোঁয়া নাকে এলে মনটা চনমন করে।”

“ঠিক আছে, আপনার সামনে আর কোনওদিন খাব না।”

“একটা কথা জিজ্ঞেস করব, শৈবাল ? আজ তোমাকে একটু যেন নার্ভাস মনে হচ্ছে, সিগারেট ধরাবার সময় তোমার হাতটা একটু-একটু কাঁপছিল !”

“একটা ব্যাপার নিয়ে বেশ চিন্তিতই আছি, কাকাবাবু ! আপনাকে সেটা

বলতেই এসেছিলাম, কিন্তু অন্য লোকজন ছিল, তারপর এই ব্যাপারটা হল !"

"এবার বলো।"

কফি এসে গেল, কফির কাপে প্রথমে দু'জনে চুমুক দিলেন। তারপর শৈবাল আস্তে-আস্তে কেওনঝড়ে দেবলীনার মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সব ঘটনাটা খুলে বললেন।

মন দিয়ে শুনলেন কাকাবাবু। একেবারে শেষের দিকে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানোর ঘটনাটা খুব আশ্চর্যের কিছু নয়। এ-রকম আগে শুনেছি। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি, তোমার বর্ণনার একটা অংশ শুনে। তুমি যখন দেবলীনাকে টিলার উপর দেখতে পেলে, তখনই ঝড় উঠেছিল ?"

"হ্যাঁ, খুব ঝড় উঠেছিল !"

"তোমার ঠিক মনে আছে ? আগেই একটু-একটু ঝড় হচ্ছিল সেই সময় বাড়ল, না হঠাৎ ঝড় শুরু হয়ে গেল ?"

"আচমকা ঝড় উঠে গেল।"

"তুমিও তো মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বেরিয়ে পড়েছিলে, তাতে অনেক সময় মাথাটা ঠিক কাজ করে না। তোমারও ভুল হতে পারে। পরদিন সকালে তুমি ঝড়ের চিহ্ন কিছু দেখেছিলে ?"

"সেটা ঠিক খেয়াল করিনি। পরের দিনই ফিরে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম। কাকাবাবু, আপনি বলছেন, স্লিপ-ওয়াকিং আশ্চর্য কিছু নয়। আমিও তা জানি। কিন্তু দেবলীনাকে যখন ডাকলুম, ও আমাকে চিনতে পারল না কেন ? যেন ভয় পেয়ে আমার হাত ছেড়ে ছুটে পালিয়ে গেল !"

"সেইসময় বোধহয় কোনও স্বপ্ন দেখছিল দেবলীনা। তুমি ওকে কোথায় খুঁজে পেলে ?"

"ওর নিজের বিছানায়। আমি তো আগে সেই জঙ্গলের খানিকটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজলুম। কোথাও ওকে না পেয়ে আমার তো পাগলের মতন অবস্থা। তখন ভাবলুম, বাড়ি ফিরে টর্চ আর রিভলভার নিয়ে আসি। ও দুটো নিয়ে নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর একবার ভাবলুম, ওর বন্ধু শর্মিলাকে ডাকি। সে ঘরে উঁকি মেরে দেখি, দুটি মেয়ে পাশাপাশি ঘুমোচ্ছে। আমি কাছে গিয়ে দেবলীনাকে ভাল করে দেখলুম। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ও যে উঠে বাইরে অতদূরে গিয়েছিল, তা যেন বিশ্বাসই করা যায় না।"

"তোমার নিজের চোখের ভুল হয়নি তো ? তুমিই যদি স্লিপ-ওয়াকার হও ? তুমিই স্বপ্নের মধ্যে হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চলে গিয়েছিলে, দেবলীনা মোটে যায়ইনি !"

"না, কাকাবাবু, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। খুকিও খালি পায়ে গিয়েছিল, আমি ঘুমন্ত খুকির পায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, পায়ের তলা ভিজে-ভিজে, বেশ

ধুলো-বালিও লেগে আছে। ও বাইরে গিয়েছিল ঠিকই, আমি ভুল দেখিনি। পরদিন সকালে ওকে যেই জিজ্ঞেস করলুম, 'খুকি, তুই কাল রাত্তিরে বাইরে গিয়েছিলি ?' ও অবাক হয়ে বলল, 'কই, না তো ?' ওর মুখ দেখেই বুঝলুম, ওর কিছুই মনে নেই। আমি আর জেরা করলুম না।"

"দিনেরবেলা সেই জায়গাটা আবার গিয়ে দেখেছিলে ?"

"না, আর দেখা হয়নি। সকাল দশটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লুম।"

"তুমি যে বললে, দেবলীনার এখন শরীর খারাপ, ওর ঠিক কী হয়েছে ?"

"সে-রকম কিছু নয়। প্রায়ই খুব মন-মরা হয়ে থাকে। একা-একা কী যেন ভাবে। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলতে পারে না। আর-একটা অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন, ওকে আমি কোনওদিন গান গাইতে শুনিনি আগে। ওর গানের গলা নেই, আর একটু যখন ছোট ছিল, তখন কিছুদিন নাচ শিখেছিল। কিন্তু সেই রাতে ও জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ একটা গান গাইতে শুরু করেছিল। এখনও মাঝে-মাঝে সেই গানটা গায়।"

"কী গান সেটা ?"

"কাকাবাবু, আমারও গানের গলা নেই, আমি গেয়ে শোনাতে পারব না। তবে অচেনা গান। এই ক'দিনেই বেশ রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা। ডাক্তার দেখিয়েছি, আমার বন্ধু ডাক্তার, সে বলল, কিচ্ছু হয়নি। কথায়-কথায় ওষুধ খাওয়াবার দরকার নেই।"

"তুমি গাড়ি এনেছ তো শৈবাল ? চলো, তোমাদের বাড়িতে একটু ঘুরে আসি, দেবলীনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছে।"

এতক্ষণ বাদে শৈবালের মুখে খুশির ঝলক দেখা গেল। উচ্ছ্বসিতভাবে তিনি বললেন, "ঠিক এইটাই আমি চাইছিলুম, কাকাবাবু। আপনি খুকির সঙ্গে কথা বললে অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। আপনি ব্যস্ত মানুষ..."

"চলো চলো, বেরিয়ে পড়া যাক !"

শৈবালের গাড়িটা পুরনো মরিস। ছোট গাড়ি, কিন্তু চলে দারুণ। বেলা এখন এগারোটা, আকাশে ঘন মেঘ। কয়েকদিন ধরেই মেঘ জমছে, কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই।

বাড়ির সামনে রাস্তার ঠিক উলটো দিকে দাঁড়িয়ে দুটো লোক গল্প করছে আপন মনে। তাদের দিকে ইঙ্গিত করে কাকাবাবু বললেন, "ওই যে লোক দুটিকে দেখছ শৈবাল, ওরা নিরীহ লোক হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে, ওরা আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখছে।"

শৈবাল সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "দুটো লোকই বেশ গাট্টাগোট্টা জোয়ান। পুলিশের লোক বলে মনে হয় !"

কাকাবাবু বললেন, "পুলিশ আর গুণ্ডাদের চেহারায় খুব মিল থাকে। লোক দুটো একবারও মুখ তুলে এদিকে তাকাচ্ছে না, তাতেই সন্দেহ হচ্ছে। ওরা

জেনে গেল যে সাপের কামড়ে আমি মরিনি। এবারে আর-একটা কিছু মতলব ভাঁজবে!"

শৈবাল গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। তারপর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়ে বললেন, "লোক দুটি সত্যিই কিন্তু এখন এই গাড়িটার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে!"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা অন্য গাড়িতে ফলো করে কি না, সেটা একটু লক্ষ রাখো। তোমার বাড়িটা চিনে না যায়। ওরা তোমার বাড়িতে গিয়ে হামলা করুক, আমি তা চাই না।"

গাড়িটা হুশ করে খানিকটা ছুটেই ডান দিকে বেঁকল। তারপর নিউ আলিপুর ঘুরে, টালিগঞ্জের মোড় দিয়ে এসে আনোয়ার শা রোডে ঢুকল। এর মধ্যে কেউ কোনও কথা বলেননি।

শৈবাল এবার বললেন, "আমি যেভাবে চালিয়েছি, কোনও গাড়ি আমার পেছন-পেছন আসতে পারবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "এক-এক সময় কী হয় জানো তো? দুটো শত্রুপক্ষের লোক আমার ওপর নজর রাখে, তখন একজন অন্য জনকে সন্দেহ করে কিংবা পুলিশ ভেবে ভয়ও পেয়ে যায়। তখন বেশ মজার ব্যাপার হয়!"

"আপনি বলছেন মজার ব্যাপার? বাপরে বাপ, আমার যদি এরকম হত, সব সময় শত্রুপক্ষ নজর রাখছে জানতে পারলে তো আমি নাজেহাল হয়ে যেতাম! আপনি এত ধীরস্থির, হাসিখুশি থাকেন কী করে?"

"কী জানি, বোধহয় অভ্যাস হয়ে গেছে। আচ্ছা শৈবাল, তোমরা কেওনঝড়ের ঠিক কোথায় ছিলে? ওই নামে তো একটা শহরও আছে, তাই না?"

"হ্যাঁ, ছোট শহর। আপনি কখনও যাননি কেওনঝড়ে?"

"গিয়েছিলুম, অনেক আগে, প্রায় আঠারো-কুড়ি বছর আগে। ভাল মনে নেই।"

"আমরা ছিলুম কেওনঝড়ে শহর থেকে বেশ কয়েকমাইল দূরে। সেখানে লোকজন বিশেষ থাকে না, জঙ্গল-জঙ্গল জায়গা। ওদিকে গোনাসিকা নামে একটা পাহাড় আছে। আপনি বৈতরণী নদীর নাম শুনেছেন তো? লোকে বলে, বৈতরণী নদীর জন্ম ওই পাহাড় থেকে। আমি অবশ্য পাহাড়ের ওপরে উঠিনি। নদীর উৎসের জায়গাটা নাকি ঠিক একটা গোরুর নাকের মতন দেখতে!"

"বৈতরণী মানে স্বর্গে যাবার নদী। ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই এই নামের নদী আছে। অবশ্য যে-কোনও সুন্দর জায়গাই তো স্বর্গ হতে পারে। তাই না?"

গাড়িটা এসে থামল শৈবাল দত্তের বাড়ির সামনে। মাত্র বছর দু'য়েক আগে

তৈরি নতুন বাড়ি। বাড়ির প্রধান দরজার পাশে একটা চৌকো সাদা পাথরে বাড়ির নাম লেখা 'বৈতরণী'।

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "একি, তোমার বাড়ির নাম 'বৈতরণী' নাকি ? আগে তো দেখিনি ! অবশ্য তোমার বাড়িতে আমি মোটে একবারই এসেছি। সে-সময় আবার লোডশেডিং ছিল।" (লেখকের 'কলকাতার জঙ্গলে' বইতে এই প্রসঙ্গ আছে।)

শৈবাল লাজুকভাবে বললেন, "না, আগে আমার বাড়ির কোনও নামই ছিল না। এবার ফিরে এসে, কেন জানি না, ওই নামটা খুব পছন্দ হল। তাই নামটা বসিয়ে দিলুম। একটু আগে আপনি তো বললেন যে, যে-কোনও সুন্দর জায়গাই স্বর্গের মতন মনে হতে পারে। নিজের বাড়ির চেয়ে আর সুন্দর জায়গা কী হতে পারে, বলুন ? সেই ছেলেবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলুম। চড়ুইপাখি আর বাবুইপাখির ঝগড়া ? চড়ুইপাখি মানুষের বাড়ির এক কোণে বাসা বেঁধে থাকে, ঝড়-জলে কষ্ট পেতে হয় না। আর বাবুইপাখির নিজের তৈরি বাসা তালগাছ-টালগাছে ঝোলে, খুব বেশি ঝড়বৃষ্টি হলে খসে পড়ে যায়। সেইজন্যেই ওই কবিতাটিতে চড়ুইপাখি বলছে, 'আমি থাকি মহা সুখে অট্টালিকা 'পরে।' আর বাবুইপাখি বলছে, 'নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা।' আপনি পড়েননি ?"

"হ্যাঁ, পড়েছি বটে।"

"আমার বাড়িটাও বাবুইয়ের বাসা বলতে পারেন। একেবারে নিজ হাতে গড়া। এ-বাড়ির নকশা, ব্লু-প্রিন্ট থেকে শুরু করে মিস্তিরি খাটিয়ে একটার পর একটা ইট গাঁথা, সবই আমি নিজে করেছি। কিন্তু বাড়িটা শেষ হবার আগেই দেবলীনার মা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। দেবলীনাও এ-বাড়িটা তেমন পছন্দ করে না। এখন ভাবছি, কী করি এই বাড়িটা নিয়ে !"

সদর-দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে শৈবাল চেঁচিয়ে ডাকলেন, "খুকি, খুকি, নীচে নেমে আয়। দ্যাখ, কে এসেছেন !"

দু'তিনবার ডেকেও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন একজন বয়স্কা বিধবা মহিলা।

শৈবাল ব্যস্তভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "পিসিমা, খুকি কোথায় ? বেরিয়ে গেছে নাকি ?"

পিসিমা বললেন, "কই, না তো ! আমাকে তো কিছু বলে যায়নি !"

শৈবাল ভুরু কুঁচকে বললেন, "তা হলে সাড়া দিচ্ছে না কেন ? সদর-দরজাটা একেবারে হাট করে খোলা। রঘুটাই বা কোথায় গেল ?"

পিসিমা বসলেন, "এই মাত্র আমি রঘুকে একটু বাজারে পাঠালুম। এতক্ষণ দরজা বন্ধই ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, শৈবাল ? দ্যাখো, দেবলীনা

হয়তো বাথরুমে গেছে, কিংবা ঘুমিয়ে পড়েছে, তোমার ডাক শুনতে পায়নি।"

শৈবাল বললেন, "আপনি বসুন, কাকাবাবু, আমি ওপরে গিয়ে দেখছি! মেয়েটার ধরন-ধারণ দেখে আমার সত্যি চিন্তা হয়!"

দু'তিনটে সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে গেলেন শৈবাল। বারবার ডাকতে লাগলেন, "খুকি, খুকি!"

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে বসবার ঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলে খুলে ফেললেন। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন দেবলীনাকে। সে একটা খোলা জানলার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরে। লাল রঙের ফ্রক পরা, তার সারা মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম।

কাকাবাবু নরম করে ডাকলেন, "দেবলীনা!"

দেবলীনা চমকে মুখ ফেরাল। কয়েক মুহূর্ত সে যেন চিনতে পারল না কাকাবাবুকে।

কাকাবাবু আবার বললেন, "কেমন আছিস রে, দেবলীনা?"

দেবলীনা চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বলল, "কাকাবাবু? আমাকে ও ডাকছে, আমাকে ও ডাকছে! ওই যে, ওই যে..."

৩

সন্তু দারুণ রাগারাগি করতে লাগল। এ-পর্যন্ত প্রত্যেকবার সে কাকাবাবুর সঙ্গে বাইরে গেছে। এবারে সে বাদ পড়ে যেতে কিছুতেই রাজি নয়।

কাকাবাবু এক কথা বলে দিয়েছেন, এবারে সন্তু তাঁর সঙ্গে যাবে না। আর মাত্র সাতদিন বাদে সন্তুর পরীক্ষা। তার পড়াশুনো নষ্ট করা চলবে না।

সন্তু মুখ গোঁজ করে বলল, "ভারী তো পরীক্ষা! টিউটোরিয়াল টেস্ট, ওটা না দিলেও এমন কিছু ক্ষতি হয় না!"

কাকাবাবু মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "উঁহু, তোর ক্লাসের অন্য ছেলেরা যখন এই পরীক্ষা দেবে, তখন তোকেও দিতে হবে। তোর বন্ধু জোজো, অরিন্দম, এরা সব পরীক্ষা দেবে, আর তুই ফাঁকি মারবি, তা কি হয়? তা ছাড়া, এবার তো আমি কোনও রহস্যের সন্ধানে যাচ্ছি না, যাচ্ছি বিশ্রাম নিতে। তুই সেখানে গিয়ে কী করবি?"

মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওঁদের কথা শুনছেন। কাকাবাবুর খোঁড়া পা নিয়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে অসুবিধে হতে পারে বলেই প্রথম-প্রথম সন্তুকে তাঁর সঙ্গে পাঠানো হত। এই প্রথম কাকাবাবু একা যেতে চাইছেন।

মা বললেন, "রাজা, তুমি বলছ তো বিশ্রাম নিতে যাচ্ছ। কিন্তু তোমার কথায় কি বিশ্বাস আছে? ওখানে গিয়ে আবার কী একটা ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে বসবে! সেই যে কথায় আছে না, তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "বঙ্গে তো যাচ্ছি না। যাচ্ছি ওড়িশায়। খুব নিরিবিলি জায়গা। দিন-পনেরো থেকে ফিরে আসব!

মা বললেন, "পড়াশুনো ফেলে সন্তুটাকে এবার তোমার সঙ্গে জোর করে পাঠাতেও পারছি না! রাজা, তুমি কিন্তু সত্যি এবারে সাবধানে থেকো। সেবারে আফ্রিকাতেও তো তুমি বিশ্রামের নাম করে গিয়েছিলে। তারপর সে কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড, প্রাণে বেঁচে গেছ নেহাত ভাগ্যের জোরে!"

কাকাবাবু বললেন, "ভাগ্য নয় বউদি, মনের জোর। তোমার ছেলেরও খুব মনের জোর। যাই হোক, এবারে সন্তু যাচ্ছে না, এবারে কোনও বিপদের ঝুঁকিই নেব না আমি। সন্তু সঙ্গে না থাকলে সত্যি আমার অসুবিধে হয়। এবারে সেইজন্যে শুধু খাব-দাব আর বই পড়ব। দেখছ না, কুড়িখানা বই নিয়ে যাচ্ছি।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তুমি সঙ্গে ওই পুঁচকে মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছ, দেখো, ওই মেয়েটাই তোমাকে কোনও গণ্ডগোলে ফেলবে!"

কাকাবাবু বললেন, "পুঁচকে মেয়ে বলছিস কী? দেবলীনার পনেরো বছর বয়েস হল! ওর খুব বুদ্ধি!"

"বুদ্ধি মানে শুধু দুষ্টু বুদ্ধি! আমি না থাকলে তুমি ওকে সামলাতেই পারবে না!"

"একটা কাজের কথা শোন্, সন্তু। আমাকে যারা উপহার পাঠিয়েছিল, তারা আরও হয়তো ওই রকম কিছু পাঠাবার চেষ্টা করবে। ওই রকম প্যাকেট-ট্যাকেট এলে নিবি না। ফিরিয়ে দিবি। যদি পোস্টে আসে কিংবা কেউ বাড়ির দরজার কাছে রেখে চলে যায়, না-খুলে এক বালতি জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিবি।"

মা বললেন, "ওই রকম প্যাকেট আবার কেউ নিয়ে এলেই আমি তাকে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব!"

কাকাবাবু বললেন, "মাঝে-মাঝে বুকপোস্টে আমার বইপত্র আসে বিদেশ থেকে। তা বলে তুমি আবার পোস্টম্যানদের পুলিশে ধরিয়ে দিও না, বউদি! সন্তু, বইয়ের প্যাকেট এলে তুই যেন সেটাকেও জলে ডুবিয়ে দিস না!"

সন্তু বলল, "বইয়ের প্যাকেট দেখে আমি ঠিকই চিনতে পারব।"

মা কাকাবাবুর বাক্স গুছোতে বসে গেলেন।

শৈবাল গাড়ির ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কাকাবাবুর ট্রেনে যাবার ইচ্ছে। কাউকে তো আর তাড়া করে যাওয়া হচ্ছে না, বেড়াবার পক্ষে ট্রেনই ভাল। আজকাল সহজে ট্রেনের টিকিট জোগাড় করা যায় না, কাকাবাবুর নাম করে ভি. আই. পি. কোটা থেকে চেয়ার কার-এ দু'খানা টিকিট পাওয়া গেল।

জানলার ধারে মুখোমুখি দু'খানা সিট। এখন সকাল দশটা। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। দেবলীনাকে আজ দারুণ খুশি দেখাচ্ছে। তার ফ্রকটা সোনালি রঙের, মাথায় একটা ওই রঙের রিবন। সেও সঙ্গে অনেকগুলো বই এনেছে।

দু'তিনটে স্টেশন যাবার পরেই কাকাবাবু একটি বাদামওয়ালাকে ডেকে দু'ঠোঙা বাদাম কিনলেন। দেবলীনাকে একটা ঠোঙা দিয়ে বললেন, "ট্রেনে যাবার সময় আমার কিছু-না-কিছু খেতে ইচ্ছে করে। কতদিন বাদে এরকম নিশ্চিন্ত মনে ট্রেনে করে বেড়াতে যাচ্ছি !"

দেবলীনা বলল, "আমার ঝাল-নুনটা বেশি ভাল লাগে। আর-একটু ঝাল-নুন চেয়ে নাও না, কাকাবাবু !"

বাদাম ভাঙতে-ভাঙতে কাকাবাবু বললেন, "ঝাল-নুনে আর সেরকম ঝাল থাকে না আজকাল ! আগে একটুখানি মুখে দিলেই 'উঃ আঃ' করতে হত।"

কাকাবাবুর পাশের সিটে একজন কাঁচা-পাকা দাড়িওয়ালা লোক বসে আছে। লোকটির বয়েস খুব বেশি মনে হয় না। তার গায়ের জামাটি বিচিত্র, অনেকগুলি নানা রঙের টুকরো-টুকরো ছিটকাপড় সেলাই করে জোড়া। মাথায় বাবরি চুল। সেই লোকটি কাকাবাবুর কথা শুনে বলল, "ঠিক বলেছেন ! আজকাল কাঁচালঙ্কাতেও সেরকম ঝাল নেই। আমরা ছেলেবেলায় যেসব ধানিলঙ্কা খেয়েছি, সে-রকম তো আর দেখাই যায় না !"

নতুন লোকের সঙ্গে ভাব জমাবার ইচ্ছে নেই কাকাবাবুর, তাই তিনি লোকটির কথায় কোনও উত্তর দিলেন না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

একটু বাদে দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, তারের ওপর ওই যে কালো-কালো পাখি দেখছি, মাঝে-মাঝে, ল্যাজটা মাছের মতন, ওগুলো কী পাখি ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওইগুলো হচ্ছে ফিঙে। মজার ব্যাপার কী জানিস, আমি তো অনেক বনে-জঙ্গলে ঘুরেছি, কোথাও ফিঙে দেখিনি। শুধু রেললাইনের ধারে টেলিগ্রাফের তারের ওপরেই এই পাখিগুলো দেখা যায় !"

পাশের দাড়িওয়ালা লোকটা বলল, "অনেকটা ঠিক বলেছেন। তবে আর কোথায় ফিঙে দেখা যায় জানেন ? গণ্ডারের শিঙে। গণ্ডারের সঙ্গে এই পাখিগুলোর খুব ভাব। ইচ্ছে করলে পদ্য বানানো যায় :

গণ্ডারের শিঙে
নাচছে একটা ফিঙে।
গণ্ডারের সর্দি হল,
ফিঙে কোথায় উড়ে গেল !"

দেবলীনা হেসে ফেলল ফিক করে।

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "মশায়ের তো অনেক কিছু জানা আছে দেখছি। গণ্ডারের সর্দি পর্যন্ত দেখে ফেলেছেন ?"

লোকটি খুব অবাক হয়ে বলল, "অবশ্যই দেখেছি। আপনি দ্যাখেননি ? এই

যে বললেন বনে-জঙ্গলে ঘুরেছেন ? গণ্ডারের সর্দি অতি আশ্চর্য ব্যাপার। গণ্ডারের কাতুকুতুর কথা জানেন তো ? কাতুকুতুতে গণ্ডারের খুব সুড়সুড়ি লাগে। আজ আপনি কাতুকুতু দিলে গণ্ডার সাত দিন পরে হাসবে। সর্দির ব্যাপারটাও তাই। গণ্ডার যদি জুন মাসে খুব বৃষ্টিতে ভেজে, সর্দি হবে সেপ্টেম্বর মাসে।"

কাকাবাবু স্বীকার করলেন, গণ্ডার সম্পর্কে তাঁর এত জ্ঞান নেই।

দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, "গণ্ডার আমার খুব ফেভারিট প্রাণী। ইচ্ছে আছে, বাড়িতে একটা গণ্ডার পুষব।"

দেবলীনার পাশে একজন বৃদ্ধ চোখের সামনে খবরের কাগজ মেলে বসে আছেন। তিনি কাগজটা নামিয়ে দাড়িওয়ালা লোকটাকে চশমার ওপর দিয়ে একবার দেখে নিয়ে আবার কাগজ পড়তে লাগলেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি গণ্ডার এত স্টাডি করলেন কোথায় ?"

"ওড়িশায়। বাড়ি থেকে প্রায়ই তো জঙ্গলে যাই।"

"ওড়িশার জঙ্গলে গণ্ডার আছে নাকি ?"

"কেন থাকবে না ? আসামে থাকতে পারে, বেঙ্গলে থাকতে পারে, তবে ওড়িশা কী দোষ করল ? আপনি সিমলিপাল ফরেস্ট দেখেছেন ?"

"তা দেখিনি বটে, কিন্তু সেখানে গণ্ডার আছে, এমন কখনও শুনিনি।"

"লোকে অনেক কিছু জানে না। ইন্ডিয়ার কোথায় জিরাফ আছে জানেন ? শোনেননি নিশ্চয়ই ! ওই সিমলিপাল ফরেস্টেই আছে। তাই নিয়েও পদ্য আছে আমার :

সিমলিপালের জিরাফ
লম্বা গলায় টানছে শুধু সিরাপ !"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, আপনি তো বেশ পদ্য বানাতে পারেন দেখছি। ওড়িশায় থাকেন কোথায় ?"

লোকটি হঠাৎ একগাল হেসে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, "জিজ্ঞেস তো করলেন কথাটা ! এখন আমি কোথায় থাকি, সে-জায়গাটার নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন ? আমি থাকি কিচিংয়ে। কিচিং কোথায় জানেন, নাম শুনেছেন ? মুখ দেখেই বুঝতে পারছি শোনেননি। তা বলে কিচিং বলে কি কোনও জায়গা নেই ? এককালে ময়ূরভঞ্জের রাজাদের রাজধানী ছিল এই কিচিং !"

কাকাবাবুও হেসে ফেলে বললেন, "হ্যাঁ, প্রথমে নামটা শুনে বুঝতে পারিনি। কিচিং শুনে মনে হচ্ছিল আপনি ঠাট্টা করছেন। এখন মনে পড়ছে, কিচিং নামে একটা জায়গা আছে ওড়িশায়। অনেক ভাঙা-চোরা মন্দির আছে সেখানে, তাই না ?"

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, "হুঁ। তবে আমি অবশ্য ওখানে বিশেষ থাকি না। কাজের জন্য সব সময় নানা জায়গায় দৌড়োদৌড়ি করতে হয়। একবার বাংলা, একবার বিহার, কখনও কখনও রাজস্থান। পাঞ্জাব থেকেও ডাক আসে।

"কী কাজ করেন আপনি ?"

"আমার কাজ...আমার কাজ...ইয়ে...সেটা ঠিক যেখানে সেখানে বলা যায় না ! তবে আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনাকে বলা যেতে পারে। কিন্তু কানে-কানে বলতে হবে !"

লোকটি কাকাবাবুর কানের কাছে নিজের মুখখানা আনবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু তাড়াতাড়ি মাথাটা সরিয়ে নিয়ে বিব্রতভাবে বললেন, "না, না, গোপন কথা যদি কিছু হয়, আমি শুনতে চাই না !"

লোকটি তবু কাকাবাবুর কাঁধ চেপে ধরে বলল, "আরে না, না, শুনুন, আমার গুরুর নিষেধ আছে বলেই কানে-কানে ছাড়া বলতে পারি না !"

কানে-কানে বলা মানে কিন্তু আস্তে বলা নয়। লোকটি কাকাবাবুর কানের কাছে মুখ এনে পাঁচজনকে শুনিয়ে বলল, "আমার কাজ হচ্ছে ভূত ধরা। বুঝলেন ?"

কাকাবাবু নিজের মাথাটাকে মুক্ত করে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, বুঝলুম। বাঃ, ভাল কাজই তো করেন আপনি !"

দেবলীনার পাশের বুড়ো লোকটি এবারে খবরের কাগজ নামিয়ে বললেন, "ভূত ধরেন মানে, আপনি কি ওঝা ? ভুতুড়ে বাড়ি থেকে আপনি ভূত তাড়াতে পারেন ?"

লোকটি বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। সেটাই আমার পেশা।"

বুড়ো লোকটি উৎসাহিত হয়ে বললেন, "তা হলে...তা হলে...আপনাকে তো আমার খুবই দরকার। চন্দননগরের গঙ্গার ধারে আমার একটা বাড়ি আছে, বুঝলেন। মাঝে-মাঝে এক-একটা রাত্তিরে সেখানে একটা অদ্ভুত খারাপ গন্ধ বেরোয়। সে যে কী বিশ্রী পচা গন্ধ, কী বলব ! সে-গন্ধের চোটে কিছুতেই টেকা যায় না। লোকে বলে, ওটা নাকি ভূতের গায়ের গন্ধ ! বাড়িটা খালি রাখতে হয়েছে।"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, হয়, এরকম হয়। ওরা আছে এক জাতের ওই রকম গন্ধওয়ালা ! গন্ধটা অনেকটা পচা তেঁতুলের মতন না !"

বৃদ্ধটি বললেন, "অ্যাঁ, মানে, পচা তেঁতুলের গন্ধ কী রকম হয় ঠিক জানি না। তবে খুবই খারাপ গন্ধ। আপনি পারবেন ব্যবস্থা করে দিতে ? তা হলে খুবই উপকার হয়।"

"পারব না কেন, এইসবই তো আমার কাজ। আমি গ্যারান্টি দিয়ে কাজ করি, তারপর পয়সা নিই।"

"তা হলে কবে আসবেন বলুন ! আপনার যা ফি লাগে আমি দেব !"

লোকটি এবার দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলল, "কবে ? সেই তো মুশকিল। আমি এখন হেভিলি বুক্‌ড। অন্তত এগারোটা কেস হাতে আছে। প্রত্যেকটা কেসে যদি পাঁচদিন করে লাগে, তা হলে পাঁচ-এগারোং সাতাত্তর দিন লাগবে..."

কাকাবাবু একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "পাঁচ-এগারোং পঞ্চান্ন হয় বোধহয়..."

লোকটি বলল, "ওই একই হল। মোট কথা, দু'তিন মাস আমি ব্যস্ত। তারপর আপনার কেসটা নিতে পারি। আপনার নাম-ঠিকানা দিন, আমি পরে জানিয়ে দেব।"

বৃদ্ধ লোকটি পকেট থেকে কাগজ বার করে ঠিকানা লিখতে লাগলেন।

দেবলীনা এতক্ষণ সব শুনছিল। এবারে সে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "ভূত কীরকম দেখতে হয় ?"

লোকটি একগাল হেসে বলল, "ভূত তো দেখাই যায় না। তার আবার কীরকম সে-রকম নাকি ? গন্ধ শুঁকে, আওয়াজ শুনে বুঝতে হয় !"

দেবলীনা আবার জিজ্ঞেস করল, "ভূত কখনও মানুষ সেজে আসে না ?"

লোকটি বলল, "ওইটি একদম বাজে কথা ! গাঁজাখুরি গল্প যতসব ! যারা ওইসব রটায়, তারা সব বুজরুক, বুঝলে মামণি ? আমি ওই সব নকল ভূতের কারবার করি না !"

কাকাবাবু এবারে লোকটির পিঠ চাপড়ে বললেন, "আপনি খুব গুণী লোক দেখছি। আপনার নামটা জানতে পারি ? আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী।"

লোকটি ভুরু কুঁচকে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী ! নামটা কেমন যেন শোনা-শোনা মনে হচ্ছে। কোথায় শুনেছি বলুন তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "খুব কমন নাম। আরও অনেকের হতে পারে। অন্য কোথাও শুনে থাকবেন নিশ্চয়ই।"

"তা হতে পারে। আমার নাম দারুকেশ্বর ওঝা। আসল পদবি কিন্তু উপাধ্যায়। যেমন চতুর্বেদী এখন হয়ে গেছে চৌবে, সেইরকম উপাধ্যায় থেকে ওঝা ! আমার নাম আপনি আগে শুনেছেন কখনও ?"

"আপনি খুব বিখ্যাত লোক বুঝি ?"

"আমার লাইনে আমি অল ইন্ডিয়া ফেমাস। যদিও খবরের কাগজে নাম ছাপা হয় না। গুরুর নিষেধ আছে।"

"এদিকে কতদূর যাচ্ছেন ? নিজের বাড়ি ফিরছেন ?"

"না, মশাই, বাড়ি যাবার টাইমই পাই না। এখন যেতে হচ্ছে কেওনঝড়, ওখানে একটা কেস আছে। খুব শক্ত কেস।"

জায়গাটার নাম শুনে কাকাবাবুর সঙ্গে দেবলীনার চোখাচোখি হল। জ্বলজ্বল

করে উঠল দেবলীনার চোখ।

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, তা হলে তো ভালই হল। আমরাও ওখানে বেড়াতে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে থেকে আপনার কাজের পদ্ধতিটা দেখার সুযোগ পেতে পারি কি ?"

দেবলীনা বলল, "আমি দেখব, আমি দেখব।"

দারুকেশ্বর বলল, "তা যদি ভয়-টয় না পাও, তা হলে দেখাব তোমাকে, মামণি !"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হলুম, দারুকেশ্বরবাবু। আপনি ভূত-প্রেত ধরার কাজ করেন, আবার বনে-জঙ্গলেও প্রায়ই যান বললেন। আপনার দেখছি অনেক দিকে উৎসাহ।"

দারুকেশ্বর বলল, "বনে-জঙ্গলে আমাকে যেতে হয়, নানারকম শিকড়-বাকড়ের সন্ধানে। আমার কাজের জন্য লাগে। আমি জন্তু-জানোয়ারও খুব ভালবাসি। ওদের স্টাডি করি। ওদের নিয়ে ছড়া বাঁধি। আর-একটা শুনবেন ?"

"শোনান।"

"মুখখানা কালো ল্যাজের বাহার
ওর নাম কী ?
গন্ধমাদন কাঁধে তুলেছিল
হনুমাঙ্কি !"

"বাঃ বাঃ ! হনুমাঙ্কি ! এই শব্দটা আপনার নিজস্ব ?"

"এরকম কত শব্দ আমি বানিয়েছি ! একটা আশ্চর্য ব্যাপার কী জানেন মশাই, গন্ধমাদন পাহাড়ে গেলে এখনও দেখবেন, সেখানে অনেক হনুমান ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা সেই আসল হনুমানের বংশধর।"

কাকাবাবু সত্যিই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "গন্ধমাদন পাহাড় ? সেটা আবার কোথায় ? সে-রকম কোনও পাহাড় আছে নাকি ?"

দারুকেশ্বর ভুরু তুলে বলল, "সে কী মশাই, আপনি কেওনঝড় যাচ্ছেন, আর গন্ধমাদন পাহাড়ের কথা জানেন না ? কেওনঝড় টাউন থেকে মাইল দশেক দূরেই তো এই পাহাড়। রাম-লক্ষ্মণের চিকিৎসার জন্য অরিজিনাল হনুমান এই গোটা পাহাড়টা তুলে নিয়ে গিয়েছিল, আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। ওষুধ পত্তরের খোঁজ করতে আমাকে ওই পাহাড়ে প্রায়ই যেতে হয়।"

কাকাবাবুর চোখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠতে দেখে দেবলীনার পাশের বুড়ো ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, "আছে, আছে, ওড়িশায় গন্ধমাদন পাহাড় আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, অনেক কিছু শেখা যাচ্ছে। আচ্ছা দারুকেশ্বরবাবু, আপনি জন্তু-জানোয়ারের নামে ছড়া বানান, ভূতদের নিয়ে কোনও ছড়া

বানাননি ?"

দারুকেশ্বর এবার চোখ কুঁচকে রহস্যময় হাসি হেসে বলল, "আছে, আছে। অনেক আছে। কিন্তু সেসব শুধু ওদের জন্য। ওগুলোই তো আমার মন্ত্র। আপনারা সেগুলো শুনলে কিসে কী হয় বলা যায় না! এ তো ছেলেখেলার ব্যাপার নয়!"

দারুকেশ্বরের সঙ্গে গল্প করতে-করতে চমৎকার সময় কেটে গেল। লোকটার কোন্ কথাটা যে সত্যি আর কোন্টা গুল, তা বোঝা শক্ত, কিন্তু গল্প করতে পারে বেশ জমিয়ে। দেবলীনারও বই পড়া হল না, সে আগ্রহের সঙ্গে শুনতে লাগল দারুকেশ্বরের কথা।

মাঝখানে যখন দুপুরের খাবার দিয়ে গেল, তখন দারুকেশ্বর তার খাবারের প্লেটটা কোলের ওপর নিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট্ট শিশি বার করল, তার মধ্যে জলের মতন কী যেন রয়েছে। শিশির ছিপি খুলে সেই জল খানিকটা ছড়িয়ে দিল তার খাবারের ওপর।

কাকাবাবু কৌতূহলের সঙ্গে তাকালেন সে-দিকে, কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

দারুকেশ্বর নিজেই বলল, "এটা কী জানেন? এটা হল বরেহিপানি জলপ্রপাতের মন্ত্রঃপূত জল। এটা ছিটিয়ে নিলে খাবারের সব দোষ কেটে যায়। আমার শত্রুর তো অভাব নেই, কে কখন খাবার নষ্ট করে দেয় বলা তো যায় না!"

শিশিটা কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আপনি নেবেন একটু?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, আমার দরকার নেই। আমার তো শত্রু নেই কেউ।"

দারুকেশ্বর বলল, "আমার শত্রুদের আবার চোখে দেখা যায় না। এখন এই ট্রেনের কামরার মধ্যেও দু'একটা ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। আচ্ছা ওরা কেউ আছে কি না একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক।"

অন্য পকেটে হাত দিয়ে দারুকেশ্বর একটা শুকনো হরীতকী বার করল। সেটা দু'আঙুলে ধরে অন্যদের দেখিয়ে বলল, "এই যে দেখছেন, এটা কী? একটা হর্তুকি, এটা ওই অশরীরীদের খুব প্রিয় খাদ্য। আমি এটা ছুঁড়ে দিচ্ছি, যদি অদৃশ্য হয়ে যায়, তা হলে বুঝবেন, এক ব্যাটা রয়েছে এখানে।"

আশপাশ থেকে আরও কয়েকজন দারুকেশ্বরের কাণ্ডকারখানা দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। দারুকেশ্বর হাতটা একবার মুঠো করে ওপরে ছুঁড়ে দিয়েই আবার মুঠো খুলল। হাতে কিছু নেই, হরীতকীটা অদৃশ্য হয়ে গেছে!

দারুকেশ্বর বলল, "দেখলেন? আছে এখানে এক ব্যাটা। তবে খুব নিরীহ আর হ্যাংলা। যারা ট্রেনে কাটা পড়ে মরে, তারা অনেক সময় চলন্ত ট্রেনের কামরায় ঘুরঘুর করে। তবে কারও ক্ষতি করে না। এই, যা, যা, তোকে খেতে

তো দিয়েছি, এবার যা ! নইলে কিন্তু বেঁধে ফেলব !"

ভূত থাক বা না থাক, কাকাবাবু বুঝলেন, দারুকেশ্বর হরীতকীটা নিয়ে যা করল, সেটা একটা সরল ম্যাজিক। একসময় তিনিও কিছু শখের ম্যাজিক শিখেছিলেন। ছোটখাটো জিনিস অদৃশ্য করার খেলা তিনিও দেখাতে পারেন। একবার ভাবলেন, পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তিনিও সেটাকে অদৃশ্য করে দেবেন অন্যদের সামনে।

তারপর ভাবলেন, না থাক। দারুকেশ্বরের খেলা দেখে অন্যরা বেশ মুগ্ধ হয়েছে। কী দরকার সেটা ভাঙার ! লোকটিকে তাঁর বেশ পছন্দই হয়েছে। আর যাই হোক, লোকটা আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতন নয় !

যাজপুর-কেওনঝড় রোড রেল স্টেশনে ট্রেনটা পৌঁছল সন্ধের সময়। এখান থেকে কেওনঝড় শহর একশো কিলোমিটারের চেয়েও বেশি দূর। বাসে প্রচণ্ড ভিড়, তাতে কাকাবাবু উঠতে পারবেন না। শৈবাল বলে দিয়েছিলেন, স্টেশনেই জিপ বা ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।

একটা গাড়ি ভাড়া করার পর কাকাবাবু দারুকেশ্বরকে বললেন, "আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন নাকি ? আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি।"

দারুকেশ্বর বলল, "তা হলে তো ভালই হয়। আমাকে স্টেশনে নিতে আসার কথা ছিল। কই, তাদের তো দেখছি না। হয়তো আরও তিনঘন্টা পরে আসবে। এখানকার লোকেরা ভাবে কী জানেন, সব ট্রেনই তিন-চার ঘন্টা লেট করে !"

গাড়িটা চলতে শুরু করার পর দারুকেশ্বর জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কেওনঝড়ে কোথায় উঠবেন ? সার্কিট হাউসে ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমাদের জন্য একটা বাড়ি ঠিক করা আছে। শহর থেকে খানিকটা দূরে, গোনাসিকা পাহাড়ের দিকে। আগেকার রাজাদের আমলের বাড়ি।"

দারুকেশ্বর চমকে উঠে বলল, "আগেকার রাজাদের আমলের বাড়ি ? স্বর্ণ-মঞ্জিলে ?"

দেবলীনা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাড়িটার নাম 'স্বর্ণ-মঞ্জিল'। গেটের সামনে যেখানে নামটা লেখা, সেখানে 'ম'-টা উঠে গেছে, স্বর্ণ-ঞ্জিল হয়ে আছে !"

দারুকেশ্বর বলল, "আজ রাতে আপনারা সেই হানাবাড়িতে গিয়ে থাকবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "হানাবাড়ি কেন হবে ? ওখানে তো লোকজন থাকে ! পাহারাদার আছে।"

"ও-বাড়ির কাছে দিনের বেলাই তো ভয়ে অনেকে যেতে পারে না।"

"সে কী ? এই দেবলীনাই তো কয়েকদিন আগে ওখানে থেকে গেছে !"

"সত্যি ? মামণি, তুমি ওখানে কোনও খারাপ গন্ধ পাওনি ?"

দেবলীনা মাথা নেড়ে বলল, "কই, না তো !"

দারুকেশ্বর বলল, "গন্ধ পাওনি ? তা হলে বিচ্ছিরি শব্দ শুনেছ নিশ্চয়ই ?"

দেবলীনা বলল, "না, সেরকম কোনও শব্দও শুনিনি ।"

"হায়নার কান্নার মতন শব্দ শোনোনি রাত্তিরের দিকে ?"

"হায়নার কান্না কীরকম, তা তো আমি জানি না !"

কাকাবাবু বললেন, "আমি হায়নার হাসির কথা জানি, হায়নার কান্নার কথা আমিও কখনও শুনিনি !"

দারুকেশ্বর প্রায় ধমক দিয়ে বলল, "যে হাসতে পারে, সে কি কখনও কাঁদে না ? হায়নারা শুধু সারাজীবন হেসেই যাবে ? যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শর্মা । হায়নারা আলবাত কাঁদে ।"

দেবলীনা বলল, "আমি কোনও কান্নার আওয়াজই শুনিনি !"

দারুকেশ্বর বলল, "হায়নার কান্না হচ্ছে কলাগাছের সঙ্গে কলাগাছের ঘষা লাগার শব্দের মতন । এই শব্দটা চিনতে হয়, সহজে বোঝা যায় না ।"

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত ভেবে দেখলেন, কলাগাছ কি দোলে যে ঘষা লাগবে ? কে জানে !

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ওই বাড়িটার কথা শুনে চমকে উঠলেন কেন দারুকেশ্বরবাবু ? ওই বাড়িটা সম্পর্কে আপনি কিছু শুনছেন ?"

দারুকেশ্বর বলল, "শুনেছি মানে, ও-বাড়ি সম্পর্কে কত গল্প আছে, তা এদিককার কে না জানে ? ও-বাড়িতে অশরীরীরা গিসগিস করছে ।"

"বাঃ, তা হলে তো আপনার পোয়া বারো ! আপনি টপাটপ তাদের ধরে ফেলবেন ।"

"আমি কেন ধরতে যাব ! ও বাড়ির মালিক কি আমাকে কল্ দিয়েছেন ? আমাকে কাজের জন্য কল্ না দিলে আমি ওদের ডিসটার্ব করি না । আপনাদের পক্ষে ও-বাড়িতে রাত কাটানো উচিত হবে না । আপনারা সার্কিট হাউসে থাকুন । ওখানে জায়গা না পান, হোটেল আছে ।"

দেবলীনা বলল, "না, আমরা ওখানেই থাকব । খুব ভাল বাড়ি । হোটেল-টোটেলে থাকতে আমার পচা লাগে !"

কাকাবাবু বললেন, "হায়নার কান্না কিংবা কলাগাছের হাসি তো দেবলীনা..."

দারুকেশ্বর বলল, "কলাগাছের হাসির কথা আমি বলিনি, দুই কলাগাছের ঘর্ষণ..."

"হ্যাঁ, ওরকম কোনও শব্দই তো দেবলীনা শুনতে পায়নি । আমি চেষ্টা করে দেখি শোনা যায় কি না ! যদি ওরা কেউ আসে, রামনাম করার বদলে আপনার নাম করব । আপনাকে নিশ্চয়ই ওরা সবাই চেনে !"

"তা চিনবে না কেন ? তবে আপনারা যদি থাকতেই চান ওখানে, তা হলে দোতলার দক্ষিণ কোণে একটা ঘর আছে, সেটাতে অন্তত রাত্তিরে ঢুকবেন না ।

ও-ঘরটা খুবই খারাপ !"

"কেন, কী হয়েছে সে-ঘরে ? সেখানে কিছু আছে ?"

"সে-কথা আজ রাত্তিরে আপনাদের বলতে চাই না। পরে তো আবার দেখা হবেই, তখন সব খুলে বলব।"

শহরে ঢুকে দারুকেশ্বর নেমে গেল একটা পেট্রোল পাম্পের কাছে। সেখানে দু'তিনটে হোটেল আছে। সাড়ে আটটা বাজে, এর মধ্যেই রাস্তায় মানুষজন অনেক কম। রাস্তায় আলো নেই, তবে আকাশে কিছুটা জ্যোৎস্না আছে।

গাড়িতে পেট্রোল নিতে হবে, তাই খানিকটা দেরি হল। তারপর ড্রাইভারটি কাকাবাবুর সঙ্গে একটা ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করল। 'স্বর্ণ-মঞ্জিল' আরও অনেক দূর, সেখানে যাবার জন্য তাকে আরও বেশি টাকা দিতে হবে। ফেরার সময় তাকে একা আসতে হবে, এই রাস্তায় ডাকাতের ভয় আছে।

কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাকে আরও পঞ্চাশ টাকা বেশি দেব, তা হলেই ডাকাতের ভয় কমে যাবে। এবার চলো।"

শহর ছাড়াবার পরই পাতলা-পাতলা জঙ্গল, তার মধ্য দিয়ে রাস্তা। বড় রাস্তা ছেড়ে আর-একটি সরু রাস্তায় ঢুকল গাড়িটা। এদিকে আর একটাও গাড়ি নেই। এখানে ডাকাতি করতে গেলেও খুব ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে ডাকাতদের। কখন একটা গাড়ি আসবে তার ঠিক নেই, হয়তো সারা সন্ধেতে একটা গাড়িও এল না।

একসময় দেবলীনা বলে উঠল, "ওই যে !"

বাড়ি তো নয় একটা প্রাসাদ। এই আধো-অন্ধকারে সেটাকে দেখাচ্ছে একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মতন। সে-বাড়ির কোথাও এক বিন্দু আলো নেই।

গেটের খুব কাছ পর্যন্ত গাড়িটা যাবে না, বেশ কিছু আগাছা জন্মে গেছে সেখানে। গাড়িটা থামবার পরই দেবলীনা ছুটে গেল গেটের কাছে। কাকাবাবু মালপত্র নামাতে লাগলেন, ড্রাইভারটি ব্যস্তভাবে বলল, "আমায় ছেড়ে দিন, স্যার। এই রাস্তায় একলা ফিরতে হবে... দেরি হলে খুব মুশকিলে পড়ে যাব..."

কাকাবাবু তাকে টাকা দিয়ে দিলেন। গাড়িটা চলে যেতেই পুরো জায়গাটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার !

৪

দেবলীনা বড় গেটটার গায়ে দুমদুম করে ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, "দুর্যোধন ! গেট খোলো ! মনোজবাবু ! শশাবাবু ! গেট খুলে দিতে বলুন !"

কেউ সাড়া দিল না। কাকাবাবু একটা একটা করে সুটকেস বয়ে নিয়ে এলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, এরা টেলিগ্রাম পায়নি না কি ? দুটো টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে !"

দেবলীনা বলল, "নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। এরা বড্ড তাড়াতাড়ি ঘুমোয়!"

"সে কী, এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে? ওদের যে রান্না করে রাখতে বলা হয়েছে। আমরা আসবার আগেই ঘুমোবে?"

"সন্ধের পর এক ঘন্টা জেগে থাকতেও এদের কষ্ট হয়। আগেরবার দেখেছি তো!"

এবার দু'জন মিলে ধাক্কা দিতে লাগলেন গেটে। চতুর্দিকে এমন নিস্তব্ধ যে, এই শব্দ বেশ ভয়ঙ্কর শোনাল, তবু কোনও মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল না।

মিনিটদশেক বাদে কাকাবাবু বললেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে ওরা বোধহয় টেলিগ্রাম পায়নি!"

দেবলীনা বলল, "বাবা নিজে আর বাবার বন্ধুও একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, তার একটাও পাবে না?"

"টেলিগ্রাম না পাওয়ার একটা কারণ হতে পারে, হয়তো পোস্টম্যান এসে ফিরে গেছে। এ-বাড়িতে কোনও মানুষই থাকে না!"

"হ্যাঁ, থাকে! একজন দরোয়ান, একজন কেয়ারটেকার আর একজন পুরনো কর্মচারী। আমি আগেরবার এসে দেখেছি তাদের!"

"তখন তারা ছিল, এখন নেই! আমরা এত চ্যাঁচামেচি করছি, এতে কুম্ভকর্ণেরও ঘুম ভেঙে যাবার কথা!"

"তা হলে কী হবে, কাকাবাবু?"

"ড্রাইভারটা তাড়াহুড়ো করে চলে গেল, না হলে আজকের রাতের মতন শহরে ফিরে যাওয়া যেত। দারুকেশ্বর ঠিক পরামর্শই দিয়েছিল। যাই হোক, এখন তো আর ফেরা যাবে না! হ্যাঁ রে দেবলীনা, এ-বাড়িতে ঢোকার দরজা নেই?"

"পেছন দিকে আর-একটা দরজা দেখেছি। সেটা সবসময় বন্ধ থাকে। একবার দেখব সেখান থেকে ডাকলে কেউ শুনতে পায় কি না?"

কাকাবাবু পকেট থেকে টর্চ বার করে বললেন, "এটা নিয়ে যা! দেখিস, সাবধান, সাপ-টাপ থাকতে পারে!"

দেবলীনা চলে যাবার পর কাকাবাবু দরজাটার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখলেন। পুরনো আমলের দরজা হলেও বেশ মজবুত। বাইরে তালা নেই, ভেতর থেকে বন্ধ। তা হলে ভেতরে নিশ্চিত কোনও মানুষ থাকার কথা!

কাকাবাবু পেছন ফিরে দেখলেন। খানিকটা ফাঁকা জায়গার পরেই জঙ্গলের রেখা। এককালে রাজারা নিরিবিলিতে থাকার জন্য এই জায়গায় বাড়ি বানিয়েছিলেন। নিরিবিলিতে থাকার জন্যও রাজারা সঙ্গে অনেক লোকজন নিয়ে আসতেন। এখন এইরকম জায়গায় এত বড় বাড়ি কে দেখাশুনো করবে?"

শেষ পর্যন্ত গেট না খুললে কি সারারাত বাইরে কাটাতে হবে ? একটু শীত-শীত করছে !

বড় গেটটার এক পাশে, নীচের দিকে একটা ছোট দরজা খুলে গেল, সেখান থেকে মুখ বার করে দেবলীনা বলল, "কাকাবাবু, এইদিক দিয়ে এসো—!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুই ভেতরে ঢুকলি কী করে ?"

"পেছন দিকে দেখি যে, এক জায়গায় পাঁচিল একদম ভাঙা ! এই গেটে তালা দেবার কোনও মানেই হয় না ।"

কাকাবাবু মাথা নিচু করে সেই ছোট দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন । সুটকেসগুলো ভেতরে আনলেন । তারপর দু'হাত ঝেড়ে বললেন, "কী চমৎকার অভ্যর্থনা রে ! এই বাড়িতে থাকতে হবে ?"

"আগের বারে কিন্তু খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল । কোনও অসুবিধে হয়নি !"

কাকাবাবু টর্চটা নিয়ে আলো ফেলে সারা বাড়িটা দেখলেন । এত বড় বাড়িতে দু'চারটে চোর-ডাকাত লুকিয়ে থাকলে বোঝার সাধ্য নেই । এ-বাড়ি পাহারা দেবার জন্য অনেক লোক দরকার, সেইজন্যই বোধহয় কেউই পাহারা দেয় না ।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে কাকাবাবু জোর-গলায় বললেন, "বাড়িতে কেউ আছে ?"

দেবলীনা ডাকল, "দুর্যোধন ! শশাবাবু !"

এবারে একটা কোণ থেকে শব্দ শোনা গেল...উঁ উঁ উঁ উঁ !

দেবলীনা কাকাবাবুর হাত চেপে ধরল ।

কাকাবাবু বললেন, "ভূত নাকি রে ? দারুকেশ্বরকে জোর করে ধরে আনা উচিত ছিল । আমি কোনওদিন ভূত দেখিনি, এবারে সেটা ভাগ্যে ঘটে যাবে মনে হচ্ছে ।"

দু'তিন ধাপ সিঁড়ির পর লম্বা টানা বারান্দা । আওয়াজটা আসছে ডান দিকের একটা কোণ থেকে, সেই দিকেই ওপরে ওঠবার সিঁড়ি । টর্চটা জ্বেলে রেখে কাকাবাবু সেই দিকে এগোতে-এগোতে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই ভূতের ভয় পাস নাকি ?"

কাকাবাবুর হাতটা আরও শক্ত করে চেপে ধরে দেবলীনা বলল, "না !"

কাকাবাবু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে ? কে ওখানে ?"

এবারে উঁউঁ শব্দটা আরও বেড়ে গেল । বোঝা গেল, শব্দটা আসছে সিঁড়ির পাশের একটা ঘর থেকে । একটা ক্রাচ তুলে তিনি ঠেলা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললেন ।

ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন লোক, ধুতি আর গেঞ্জি পরা । লোকটির মাথায় একটাও চুল নেই । টাক না ন্যাড়ামাথা, তা ঠিক বোঝা যায় না ।

দেবলীনা বলে উঠল, "এ তো শশাবাবু !"

কাকাবাবু বললেন, "ভূত নয় তা হলে ? এঃ হে !"

দেবলীনা লোকটির কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, "শশাবাবু ! ও শশাবাবু ! কী হয়েছে আপনার ?"

লোকটি এবারে মুখ ফিরিয়ে বলল, "মেরে ফেললে ! মেরে ফেললে ! ওগো, আমাকে বাঁচাও ! বাঁচাও !"

দেবলীনা বলল, "আপনাকে কে মেরে ফেলবে ? এখানে তো আর কেউ নেই !"

লোকটি বলল, "কে ! তুমি কে মা ?"

"আমি দেবলীনা ! মনে নেই আমাকে ? কয়েকদিন আগেই তো আমি এসেছিলুম !"

"তুমি...তুমি সেই সুন্দর দিদিমণি ? তুমি এসে আমাকে বাঁচালে। ওরা তোমার কোনও ক্ষতি করেনি তো ?"

"ওরা মানে কারা ?"

"কী জানি, দিদিমণি, তা কি জানি ! ওরা আমার গলা টিপে মারতে এসেছিল। আমি আর এখানে চাকরি করব না। ওরে বাপ রে বাপ, প্রাণটা বেরিয়ে যেত আর একটু হলে !"

"দুর্যোধন, মনোজবাবু, এঁরা সব গেলেন কোথায় ?"

"পালিয়েছে বোধহয়। আমাকে ফেলে পালিয়েছে। আমি রান্না করছিলুম, বুঝলে দিদিমণি, হঠাৎ ওপরতলায় ধুড়ুম-ধাড়াম, ধুড়ুম-ধাড়াম ! ওরে বাপ, ঠিক যেন শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ! সে কী আওয়াজ ! আমি 'কে রে, কে রে' বলে উঠতেই দেখি মনোজবাবু দৌড়ে পালাচ্ছে। দুর্যোধন ব্যাটা বোধহয় আগেই লম্বা দিয়েছিল। তারপর ওপর থেকে কারা যেন দুদ্দাড় করে নেমে এল...এই দ্যাখো, এখনও আমার বুকটা হাপরের মতন ধড়াস-ধড়াস করছে !"

"তারপর ? তারপর কী হল ?"

"আমাকে গলা টিপে মারতে এল গো দিদিমণি ! মনোজবাবু কীরকম নিমকহারাম বলো ! ওকে আমি কতরকম রান্না করে খাওয়াই, আর সেই লোক কিনা বিপদের মুখে আমায় ফেলে পালিয়ে গেল !"

"আমরা যে আসব, আপনারা জানতেন না ? টেলিগ্রাম পাননি ?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি। তোমাদের জন্যেই তো আমি রান্না করছিলুম গো !"

কাকাবাবু বললেন, "যাক, এতক্ষণে একটা ভাল খবর পাওয়া গেল। বেশ খিদে পেয়ে গেছে। রান্নাটান্নাগুলো আছে তো ? নাকি ওই শুম্ভ-নিশুম্ভরা খেয়ে গেছে ?"

দেবলীনা বলল, "শশাবাবু, ইনি কাকাবাবু ! এবারে কাকাবাবু এসেছেন, আর কোনও ভয় নেই।"

শশাবাবু উঠে বসে চোখ গোল-গোল করে বলল, "নমস্কার ! আপনারা এ-বাড়িতে থাকতে এলেন, হায় পোড়াকপাল, এখানে যে আপনাদের যত্ন-আত্তি করার কোনও ব্যবস্থাই নেই। আগে কত কিছু ছিল ! তার ওপর এখন আবার এইসব উপদ্রব !"

দেবলীনা বলল, "আমরা যে গত মাসে এলুম, তখন তো ওপরে কোনও আওয়াজ-টাওয়াজ শুনতে পাইনি ?"

শশাবাবু বলল, "মাঝে-মাঝে হয়। এই তো মাস-ছয়েক বাদে আবার শুরু হল। সেবারে তোমাদের বলিনি, ভয়-টয় পাবে...কলকাতার দাদাবাবুকে চিঠি লেখা হয়েছে, উনি কিছুই করছেন না।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা আপনাকে গলা টিপে মারতে এসেছিল বললেন। তারপর কী হল, আপনাকে মারল না কেন ?"

শশাবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "অ্যাঁ ? কী বললেন ?"

"ওরা আপনাকে গলা টিপে মারতে এসেও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিল কেন ?"

"ছেড়ে দিল...মানে...আপনি চান ওরা আমাকে মেরে ফেললেই ভাল হত ?"

"না, না, আমি তা চাইব কেন ? আমি জানতে চাইছি যে, কারা সব যেন আপনাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে এল, তারপর কী হল ? তারা এমনি-এমনি চলে গেল ?"

"তা জানি না। তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম !"

"তাদের চোখে দেখেছেন ? কীরকম দেখতে ?"

"অন্ধকার হয়ে গেল যে ! সব বাতি নিভে গেল। শুধু আওয়াজ শুনেছি, বিকট আওয়াজ ! ওঃ, ওঃ, কানে তালা লেগে গিয়েছিল..."

কাকাবাবু দু'বার জোরে-জোরে নিশ্বাস টেনে বললেন, "ঘরের মধ্যে একটা গন্ধ পাচ্ছিস, দেবলীনা ?"

"হ্যাঁ, পাচ্ছি ! কিসের গন্ধ বলো তো !"

"গন্ধ আর আওয়াজ ! তাই দিয়েই ওদের চেনা যায়, দারুকেশ্বর এই রকমই বলেছিল না ? তা হলে, শশাবাবু, আপনি দয়া করে আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করুন। কাল বাজার থেকে কয়েক প্যাকেট ধূপ কিনে আনবেন। ধূপের গন্ধ অনেক গন্ধ ঢেকে দেয়। আমরা কোন্ ঘরে থাকব ?"

"ঘর তো অনেকই আছে। যে-ঘরে ইচ্ছে থাকতে পারেন। তবে ওপরতলায় কী হয়ে গেছে, তা জানি না !"

"দেখুন, আমার একটা পা খোঁড়া। বারবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে আমার অসুবিধে হয়। আমি একতলাতেই থাকতে চাই। একতলায় যদি পাশাপাশি দু'খানা ঘর থাকে, তাতে আমি আর দেবলীনা থাকতে পারি।"

দেবলীনা বলল, "না, কাকাবাবু, একতলার ঘরগুলো কীরকম দিনের বেলাতে অন্ধকার। ওপরের বারান্দা থেকে চমৎকার বৃষ্টি দেখা যায়। আমরা ওপরেই

থাকব। তুমি বেশি ওপর-নীচ করবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "শশাবাবু, আপনাদের লণ্ঠন, বা হ্যাজাক কিছু নেই? অন্ধকারের মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?"

শশাবাবু বলল, "হ্যাঁ, হ্যারিকেন, হ্যাজাক, সবই তো থাকার কথা। দুর্যোধন ব্যাটা কোথায় যে গেল! দেখছি, রান্নাঘরের আলোটা যদি জ্বালা যায়!"

"আপনি আলো জ্বালান। ততক্ষণ দেবলীনা আর আমি ওপরতলাটা দেখে আসি!"

শশাবাবু আবার ভয় পেয়ে বলল, "না স্যার, আমায় একা ফেলে যাবেন না! একা থাকলেই আমার মাথা ঘুরবে!"

হঠাৎ ওপরতলায় ঘট-ঘট-ঘট-ঘট করে একটা আওয়াজ হল। যেন একটা ভারী কিছু জিনিস গড়াচ্ছে। সেই আওয়াজে শশাবাবু ভয় পেয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, "ওই যে, শুনলেন? শুনলেন? আবার শুরু হল!"

দেবলীনা অস্বাভাবিক জোরে চেঁচিয়ে বলল, "আমি ওপরে যাব। আমি ওপরে গিয়ে দেখব!"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ওপরে তো একবার যেতেই হয়। দেবলীনা, তুই টর্চটা ধর্। আমার ঠিক ডান পাশে থাকবি। শশাবাবু, আপনি তো একা নীচে থাকতে পারবেন না। আপনি আমাদের পেছনে পেছনে আসুন!"

শশাবাবু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "এখন ওপরে যাবেন না! ওরা বড় সাঙ্ঘাতিক...কী থেকে কী হয়ে যায় বলা যায় না!"

কাকাবাবু বললেন, "কী থেকে কী হয়, সেটাই তো আমার খুব দেখার ইচ্ছে। নিন, চলুন!"

হাতব্যাগ থেকে রিভলভারটা বার করে নিয়ে, তার ডগায় দু'বার ফুঁ দিয়ে বললেন, "অশরীরীদের গায়ে তো গুলি লাগে না। তবে মানুষের মূর্তিধারী যদি কেউ থাকে, তাদের জন্য এটা হাতে রাখা দরকার! সিঁড়ি দিয়ে আস্তে-আস্তে উঠবি, তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই!"

বেশ চওড়া কাঠের সিঁড়ি, একপাশে কারুকার্য করা রেলিং। একসময়ে পুরো সিঁড়িতেই কার্পেট পাতা ছিল, এখন তা ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে, কয়েক জায়গায় তার চিহ্ন দেখা যায়। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ওদের পায়ের শব্দ হতে লাগল।

ওপরের আওয়াজটা থেমে গেছে।

দোতলায় ওঠবার ঠিক মুখে কাকাবাবু থমকে গিয়ে দেবলীনাকে বললেন, "আলো ফেলে আগে গোটা বারান্দাটা দেখে নে।"

অনেকটা লম্বা বারান্দা, টর্চের আলো শেষ পর্যন্ত ভাল করে পৌঁছয় না। তারই মধ্যে যতদূর মনে হল, বারান্দায় কেউ নেই। খানিকটা দূরে কিছু একটা গোল-মতন জিনিস পড়ে আছে।

শশাবাবু বলল, "মু-মু-মু-মু-মুণ্ডু! ওই যে একটা মু-মু-মুণ্ডু!"

কাকাবাবু বললেন, "কার মুণ্ডু বলুন তো। চলুন, দেখা যাক!"

সে-দিকে পা বাড়াবার আগে কাকাবাবু রিভলভারটা উঁচু করে গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন, "এখানে যদি কেউ লুকিয়ে থাকো, সামনে এগিয়ে এসো! কোনও ভয় নেই! আমরা কোনও শাস্তি দেব না!"

তারপর তিনি দেবলীনার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "ভূত-টুত যদি থেকেও থাকে, অনেক সময় তারাও মানুষকে ভয় পায়, বুঝলি! সব মানুষ যেমন সাহসী হয় না, সেইরকম সব ভূতও সাহসী হতে পারে না!"

তারপর তিনি শশাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভয় পেলে মানুষের চোখের দৃষ্টিও নষ্ট হয়ে যায় বুঝি? ওই জিনিসটাকে আপনি একটা মুণ্ডু বললেন কী করে? ওটা তো একটা ফ্লাওয়ার ভাস!"

বারান্দাটার রেলিংয়ের দিক ঘেঁষে হাঁটতে লাগলেন কাকাবাবু। সারি-সারি ঘরগুলির সব ক'টারই দরজা বন্ধ। দেওয়াল থেকে দুটো ছবি খসে পড়ে গেছে, এখানে-ওখানে ভাঙা কাচ ছড়ানো। মেঝেতে যেটা গড়াচ্ছে, সেটা একটা নীল রঙের গোল চিনেমাটির ফ্লাওয়ার ভাস, তার পাশে আর-একটা ফুলদানি ভাঙা।

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে এই ব্যাপার!"

শশাবাবু বলল, "ওরা ভেঙেছে! ওরা এখানে দাপাদাপি করেছে!"

"সেই ওরা-দেরই তো দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধের দিকে এখানে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল?"

"আজ্ঞে না! বৃষ্টি মাত্র কয়েক ফোঁটা, আর একটু জোরে হাওয়া দিয়েছিল শুধু!"

এই সময় একতলায় কে যেন ডেকে উঠল, "শশাদা! ও শশাদা! বাবুরা এসেছেন?"

দেবলীনা বলল, "ওই তো দুর্যোধন! দুর্যোধনের গলা!"

রেলিংয়ের কাছে গিয়ে বলল, "এই যে, আমরা ওপরে। দুর্যোধন, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

তলা থেকে উত্তর এল, "দিদিমণি, তোমরা এসে গেছ! আমি তোমাদের গাড়ি দেখবার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম এতক্ষণ!"

কাকাবাবু বললেন, "ওকে বল, একটা বাতি জ্বেলে নিয়ে ওপরে আসতে। আমাদের গাড়ি দেখতে গিয়ে ও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল!"

তারপর তিনি শশাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "গেট বন্ধ থাকতেও আপনার ওই দুর্যোধন আর মনোজবাবু বাইরে চলে গেল কী করে?"

শশাবাবু এতক্ষণে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে। সে বলল, "বড় গেট তো বরাবরই বন্ধ থাকে, স্যার। পেছন দিক দিয়ে যাওয়া-আসার ব্যবস্থা আছে।"

"তা হলে বাইরের যে-কোনও লোকও পেছন দিক দিয়ে এ-বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে?"

"বাইরের লোক এদিকে কেউ আসে না, স্যার! আমরা ক'জন আছি শুধু চাকরির দায়ে।"

দেবলীনা একটা ঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে বলল, "আমি আর শর্মিলা এই ঘরে ছিলাম। আর পাশের ঘরটায় বাবা।"

কাকাবাবু বললেন, "দ্যাখ তো ঘরের মধ্যে চেয়ার আছে কি না। তা হলে বারান্দায় একটু বসা যাবে!"

ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেবলীনা দারুণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কে? ওখানে...ওরে বাবা, ওরে বাবা..."

কাকাবাবু এক লাফে দরজার কাছে এসে দেখলেন, ঘরের মধ্যে এক কোণে দুটো আগুনের ভাটার মতন জ্বলন্ত চোখ। তিনি আর মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে পরপর দুটো গুলি চালালেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটা পাখির তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল।

শব্দটি শুনেই কাকাবাবু আফশোসের সঙ্গে বলে উঠলেন, "ইস, ছি ছি ছি ছি, একটা প্যাঁচাকে মেরে ফেললাম! দেবলীনা, তুই এমন ভয় পেয়ে চ্যাঁচালি, তোর হাতে টর্চ রয়েছে, ভাল করে দেখে নিতে পারলি না?"

ঘরের এক দিকের দেওয়াল ঘেঁষা একটা বড় আলমারি, সেই আলমারির মাথায় বসে ছিল প্যাঁচাটা। কাকাবাবু কাছে গিয়ে দেখলেন, মেঝেতে পড়ে তখনও পাখিটা ছটফট করছে। বেশ বড় আকারের একটা ভুতুমপ্যাঁচা, দু'দিকে অনেকখানি ডানা ছড়ানো।

দেবলীনা প্যাঁচাটাকে ধরতে যাচ্ছিল, কাকাবাবু তাকে সরিয়ে এনে বললেন, "এখন আর ওর গায়ে হাত দিস না। মরণ-কামড় দিতে পারে। ওর আর বাঁচার আশা নেই!"

এক হাতে একটা লণ্ঠন, অন্য হাতে একটা লাঠি নিয়ে একজন রোগা, লম্বা লোক ঘরে ঢুকে বলল, "কেয়া হুয়া? কেয়া হুয়া?"

দেবলীনা বলল, "দুর্যোধন, ঘরের মধ্যে একটা মস্ত বড় প্যাঁচা ঢুকে বসে ছিল কী করে?"

দুর্যোধন কাছে গিয়ে বলল, "আহা রে! এ বেচারি তো ছাদে থাকে!"

কাকাবাবু বললেন, "বৃষ্টির সময় ঘরে ঢুকে এসেছে। জানলা তো খোলাই দেখছি। মেঝেতে বৃষ্টির জল গড়াচ্ছে।"

দুর্যোধন এগিয়ে এসে ডানা ধরে প্যাঁচাটাকে উঁচু করে তুলল। এর মধ্যেই তার স্পন্দন থেমে গেছে।

দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "দুর্যোধন, মনোজবাবু কোথায়?"

"মনোজবাবু তো সাতদিনের ছুটিতে গেছেন। কাল বিকেলে আসবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? এই যে শশাবাবু বললেন, কারা সব ওপরে মারামারি করছিল, তাই দেখে তুমি আর মনোজবাবু ভয়ে পালিয়েছ শশাবাবুকে

একা ফেলে। তারা শশাবাবুর গলা টিপে ধরতে গিয়েছিল !"

দুর্যোধন বলল, "শশাদা, তুমি আজ আবার অনেক গাঁজা খেয়েছ ?"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, নীচের ঘরে সেই গন্ধটাই পেয়েছিলাম !"

শশাবাবু বলল, "মোটেই খাইনি, দুটো টান মোটে দিয়েছি। তোকে যে দেখলুম দৌড়ে চলে যেতে !"

কাকাবাবু বললেন, "আপনারা এমন প্যানিক সৃষ্টি করেছিলেন, যার জন্য প্যাঁচাটা মরল। আমি পাখি মারা মোটেই পছন্দ করি না। ভুতুমপ্যাঁচার চোখ অন্ধকারে হঠাৎ দেখলে সবারই ভয় লাগে।...শুধু শুধু দুটো গুলিও খরচ হয়ে গেল !"

দুর্যোধন প্যাঁচাটাকে তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেল। কাকাবাবু শশাবাবুকে বললেন, "আপনি এবার খাবার গরম করুন। কয়েকটা ঘরে তালা বন্ধ দেখলাম। চাবিগুলো কার কাছে আছে ?"

শশাবাবু টাক-মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "সে-সব ওই দুর্যোধনের কাছে থাকে। আমি রান্নাবান্না করি। দুর্যোধন মিথ্যে কথা বলেছে, ও ভয় পেয়েই পালিয়েছিল ! ওপরে ছবির কাচগুলো ভাঙল কে ? ফুলদানিটা কি আপনা-আপনি বারান্দায় গড়াচ্ছিল !"

একটু বাদে দুর্যোধনকে ডেকে সব ক'টা ঘরের দরজা খুলে দেখা হল। কোনও ঘরেই অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। ঘরগুলোতে অনেকদিন ঝাঁট পড়েনি বোঝা যায়। কাকাবাবু প্রত্যেকটি ঘরের ভেতরে ঢুকে পরীক্ষা করে দেখলেন।

দক্ষিণ দিকের একেবারে কোণের ঘরটির সামনে এসে দুর্যোধন বলল, "এটা বাবু তোশক-ঘর !"

কাকাবাবু বললেন, "তালাটা খোলো।"

"কত্তাবাবুরা এই ঘর খুলতে বারণ করেছেন। এর চাবি আমার কাছে নাই, মনোজবাবুর কাছে আছে বোধকরি।"

"তোমার কলকাতার বাবু যে আমাদের বলে দিয়েছেন, আমরা এ-বাড়ির যে-কোনও জায়গায় থাকতে পারি ? আমি এই ঘরটাও দেখতে চাই। মনোজবাবু কি চাবি সঙ্গে নিয়ে গেছেন ? তাঁর ঘরে চাবি আছে কি না দেখে এসো !"

দুর্যোধন খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে নীচে চলে গেল।

কাকাবাবু দেবলীনাকে বললেন, "এ যেন ঠিক রূপকথার মতন। দক্ষিণের কোণের ঘরে যাওয়া নিষেধ ! দারুকেশ্বরও এই ঘরটা সম্পর্কে আমাদের সাবধান করেছিল না রে ?"

"হ্যাঁ, এই ঘরটা ! আমরা আগেরবার এসেও এই ঘরটা খোলা দেখিনি।"

"দারুকেশ্বর ওই কথাটা কেন বলেছিল জানিস ? যাতে আমরা এই ঘরটাই

ভাল করে দেখি। বারণ করলেই বেশি করে কৌতূহল জাগে তাই না ?"

"থাকার জন্য এই ঘরটাই তো সবচেয়ে ভাল মনে হচ্ছে। বারান্দার এই পাশটা থেকে দেখা যায় একটা পুকুর, তার ওপারে একটা শিবমন্দির। বেশ বড় মন্দিরটা, ভেতরে অন্ধকার-অন্ধকার।"

"পুকুর আছে, বাঃ ? এদের কাছে যদি বঁড়শি পাওয়া যায়, তা হলে আমি কাল দুপুরে মাছ ধরতে বসব ! আচ্ছা দেবলীনা, এই বাড়িটার উলটো দিকে যে জঙ্গলটি রয়েছে, তার মধ্যে একটা বালির টিলা আছে। তাই না ?"

"জঙ্গলের মধ্যে টিলা আছে ? তুমি কী করে জানলে ?"

"তোর বাবার কাছে শুনেছি। তুই সেই টিলাটার ওপরে উঠেছিস ?"

"না তো !"

"আগেরবার এসে উঠিসনি ? সেখান থেকে কি অনেক দূর দেখা যায় ?"

"আমি দেখিনি তো টিলাটা !"

"দেখিসনি ? ও, ঠিক আছে, তুই আর আমি দু'জনে মিলে এবারে দেখতে যাব।"

এই সময় দুর্যোধন আর-একটি চাবির গোছা নিয়ে এল। তার মধ্যে থেকে একটা চাবি বেছে কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আপনি খুলুন, বাবু !"

"কেন, তোমার আপত্তি কিসের ?"

"এই ঘরে আমাদের মেজো-রাজাবাবুর মেয়ে চম্পা...সে মরে গেল তো ! সোনার প্রতিমা ছিল, বড় সুন্দর ছিল...অনেকটা এই দিদিমণির মতন দেখতে..."

"কী হয়েছিল তার ?"

"আর বাবু বলবেন না সে-কথা। মনে পড়লেই বড় কষ্ট হয় ! তারপর থেকে মেজো-রাজাবাবু আর এলেনই না এ-বাড়িতে।"

কাকাবাবু তালাটা খুললেন। দুর্যোধনের কাছ থেকে আলোটা নিয়ে পা বাড়ালেন ভেতরে। ঘরটা লেপ, তোশক, বালিশে প্রায় ভর্তি। অনেকগুলো ঘরের বিছানা এখানে জড়ো করে রাখা আছে। খুব ন্যাপথলিনের গন্ধ।

কাকাবাবু বেশ নিরাশই হলেন ঘরটা দেখে। এই ? অন্তত কিছু চামচিকেও যদি ওড়াউড়ি করত, তা হলেও গা'টা একটু ছমছম করতে পারত।

দেবলীনা আর দুর্যোধন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কাকাবাবু বললেন, "এই ঘরটায় শোওয়া যাবে না রে ! এখানে যে বিছানার পাহাড়। এত বিছানা সরাবে কে ?"

দেবলীনাও খানিকটা হতাশভাবে বলল, "এ-ঘরে আর কিছু নেই ?"

কাকাবাবু বললেন, "দক্ষিণের কোণের ঘরে শুধু কতকগুলো বিছানা-বালিশ ? ছি ছি ছি ! চল দেবলীনা, এখানে আর থাকার দরকার নেই !"

দুর্যোধন কাকাবাবুদের শোওয়ার ঘরটা খানিকটা গোছগাছ করে দিল। কয়েকখানা চেয়ার এনে পাতা হল বারান্দায়। দেবলীনা ও কাকাবাবু পোশাক

বদলে এসে বসলেন সেখানে। এখন দোতলায় একটি জোরালো হ্যাজাকবাতি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আকাশে কালো মেঘ ঢেকে দিয়েছে জ্যোৎস্না। রাত্তিরে আবার বৃষ্টি হবে মনে হয়।

শশাবাবু একটু পরেই খাবার নিয়ে এল ওপরে। ভাত, ডাল, পটলের তরকারি আর ডিমের ঝোল। রান্নার স্বাদ অবশ্য মন্দ নয়। দেবলীনা ডিম পছন্দ করে না, সে বেশি ভাত খেতে চাইল না।

দোতলাতেই বাথরুম, জলের কল আছে, কিন্তু কলে জল নেই। ওপরের ট্যাঙ্কে জল ভরা হয়নি। দুর্যোধন মগে করে জল নিয়ে এসেছে।

হাত-টাত ধুয়ে কাকাবাবু দু'শো টাকা বার করে একশো একশো করে দিলেন দুর্যোধন আর শশাবাবুকে। দু'জনকেই বললেন, "কালই ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করে জল ভরা চাই। ভাল করে বাজার করে আনবে। ডিম দেবে শুধু ব্রেকফাস্টের সময়। দুপুরে মাছ আর রাত্তিরে মাংস। বাজার কত দূরে ?"

দুর্যোধন বলল, "বাজার তো বাবু ছ'মাইল দূরে। সাইকেলে যেতে হয়।"

শশাবাবু মিনমিন করে বলল, "আপনি টাকা দিচ্ছেন ? বাজারের টাকা স্যার মনোজবাবু দিয়ে গেছেন। অতিথিদের খরচ এস্টেট থেকে দেওয়া হয় ! অনেক ডিম আর আলু কেনা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "টাকাগুলো রাখো তোমাদের কাছে। আমি সঙ্গে কফি এনেছি। শিশিটা নিয়ে যাও, রাত্তির বেলা খাওয়ার পর আমার এক কাপ কফি লাগে।"

দুর্যোধন আর শশাবাবু চলে যাওয়ার পর দেবলীনা একখানা বই খুলে বসল। কাকাবাবু চুপ করে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ, তার মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল শেয়ালের ডাক। একটা শেয়াল সামনের জঙ্গলের একদিক থেকে ডাকল, অন্যদিক থেকে আর-একটা শেয়াল যেন তার উত্তর দিল।

একটু বাদে কাকাবাবু বললেন, "দেবলীনা, তোকে একটা কথা বলি। আগেরবার যখন এসেছিলি, তখন পর-পর দু'দিন তুই মাঝরাতে জেগে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলি। সে-কথা তোর একটুও মনে নেই, তাই না ?"

দেবলীনা একটু চমকে উঠে বলল, "না। বিশ্বাস করো, কিচ্ছু মনে নেই। বাবা আমাকে বলেছিল, কিন্তু আমার নিজেরই তো বিশ্বাস হচ্ছে না। ঘুমের মধ্যে কেউ হাঁটতে পারে ? চোখ খোলা থাকে, না চোখ বোজা ?"

"চোখ বুজে হাঁটা অসম্ভব ! চোখ খুলেই হাঁটে, তবে ঘুমের ঘোর থাকে। আচ্ছা, সেবারে এসে তুই এখানে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিলি ? কোনও কারণে ভয় পেয়েছিলি ?"

"না, কিচ্ছু হয়নি। খুব ভাল লেগেছিল। সে জন্যই তো আবার আসতে ইচ্ছে হল।"

"সেবারে ওই দক্ষিণের কোণের ঘরটা খুলিসনি ? চম্পা বলে যে একটি মেয়ে ওই ঘরে মারা গিয়েছিল, সে-কথাও শুনিসনি ?"

"না, কেউ বলেননি। সেবারে মনোজবাবু অনেক শিকারের গল্প বলেছিলেন আমাদের। মনোজবাবুর সঙ্গেই আমরা জঙ্গলে গেলুম বেড়াতে। এই শশাবাবু মনোজবাবুকে খুব ভয় পায়। মনোজবাবু থাকলে কাছে আসে না।"

"তা হলে তুই যে সেদিন বললি, তোর মাঝে-মাঝে মনে হয়, কেউ তোকে হাতছানি দিয়ে মাঝে মাঝে ডাকে, তাকে তুই প্রথমে কোথায় দেখলি ?"

"সে একটা মেয়ে, মনে হয় ঠিক আমারই বয়েসি। সাদা ফ্রক পরা। হাসি-হাসি মুখে হাতছানি দিয়ে বলে, 'এসো, এসো !' তাকে আমি প্রথমে দেখি, এ-বাড়ির পেছনে পুকুরের পাশে যে শিবমন্দিরটা, তার দরজার কাছে। আমাকে হাতছানি দিয়ে সে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেল। আমি দৌড়ে গিয়ে আর তাকে দেখতে পেলুম না। সেবারে তো আমার সঙ্গে আমার বন্ধু শর্মিলা ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুই মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছিস ?' ও বলল, 'কই না তো ?' তা হলে নিশ্চয়ই আমার চোখের ভুল। কিন্তু সেই মেয়েটিকে আমি আরও তিন-চারবার দেখেছি। কলকাতাতেও দেখেছি। একটা মেয়ে সত্যি-সত্যি আমায় ডাকে, একটু পরেই মিলিয়ে যায়।"

"কোনও গল্পে এরকম কোনও মেয়ের কথা পড়েছিস ? অনেক সময় গল্পের চরিত্রও খুব সত্যি মনে হয়। আমি যখন ছোট ছিলুম, আমার খুব প্রিয় বই ছিল 'দ্য হাঞ্চব্যাক অফ নত্‌রদাম'। ওর মধ্যে কোয়াসিমোদো বলে যে চরিত্রটা আছে, তার কথা আমি প্রায়ই ভাবতুম, তারপর সত্যি-সত্যি একদিন জগুবাবুর বাজারে যেন মনে হল, কোয়াসিমোদোকে দেখতে পেলুম ভিড়ের মধ্যে। আর একদিন তাকে দেখলুম ব্যাণ্ডেল চার্চে। একটু উঁকি মেরেই সে পালিয়ে গেল। আরও কয়েকবার এরকম দেখেছি। তোরও সেরকম হচ্ছে না তো ?"

"কী জানি, তা হতে পারে। কিন্তু কাকাবাবু, ওই মেয়েটিকে দেখলে আমার একটুও ভয় করে না। বরং ও কী দেখাতে চায়, সেটা দেখতে ইচ্ছে করে।"

"ঠিক আছে, আজকের রাতটা ভাল করে ঘুমিয়ে রেস্ট নেওয়া যাক, কাল সন্ধেবেলা আমি তোর ওপর একটা এক্সপেরিমেন্ট করব।"

"কী এক্সপেরিমেন্ট ?"

"একসময় আমি শখ করে কিছুটা ম্যাজিক, হিপনোটিজ্‌ম এই সব শিখেছিলুম। লন্ডনে যখন পড়াশুনো করতে গিয়েছিলুম, তখন একবার ভিয়েনায় বেড়াতে গিয়ে ডঃ যোহান এঙ্গেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি কে জানিস ? ফ্রয়েডের নাম শুনেছিস ? সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মানুষের মনের চিকিৎসার যুগান্তর ঘটিয়ে দিয়ে গেছেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ-যুগের একজন প্রধান মানুষ। ওই যোহান এঙ্গেল হলেন সেই ফ্রয়েড সাহেবের এক

মেয়ের ছেলে, সাক্ষাৎ নাতি যাকে বলে ! ভদ্রলোক তখনই বেশ বুড়ো, কিন্তু হিপনোটিজ্‌ম জানেন খুব ভাল। মানুষকে আস্তে-আস্তে ঘুম পাড়িয়ে তার মনের কথা বার করে আনেন। আমি তাঁর চ্যালা হয়ে গিয়েছিলুম কিছুদিনের জন্য। সত্যি হিপনোটাইজ করলে মানুষ ঘুমের মধ্যে এমন সব কথা বলে, যা তার অন্য সময় মনে থাকে না। কাল তোকে আমি হিপনোটাইজ করে দেখব। তুই ভয় পাবি না তো ?"

"না, ভয় পাব কেন ?"

এই সময় শশাবাবু কাকাবাবুর জন্য এক কাপ কফি নিয়ে এল। দেবলীনার জন্য এক গেলাস দুধও এনেছে।

দেবলীনা দুধ দেখে হেসে ফেলল। বলল, "আমি কচি খুকি না কি, যে রাত্তিরে দুধ খাব ?"

শশাবাবু বলল, "খেয়ে নাও দিদিমণি, এখানকার দুধ খুব খাঁটি, কলকাতায় এরকম পাবে না। রাত্তিরে ভাল ঘুম হবে !"

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা শশাবাবু, তুমি এ-বাড়িতে কতদিন কাজ করছ ?"

কিছু একটা চিন্তা করতে হলেই শশাবাবু মাথায় হাত বুলোয়। তাতে যেন তার বুদ্ধি নাড়াচাড়া খায়। কয়েকবার মাথায় হাত বুলিয়ে হিসেব করে সে বলল, "তা বাবু, হল ঠিক সাতাশ বছর। প্রথমে কাজ পেয়েছিলুম রাজাবাবুদের কটকের বাড়িতে। তারপর বড়-রাজাবাবু বুড়ো বয়েসে এই বাড়িতেই এসে ছিলেন, তিনি আমাকে এখানে নিয়ে এলেন। বড়-রাজাবাবু তো মারা গেলেন এ-বাড়িতেই !"

"রাজারা ক'ভাই ছিলেন ?"

"পাঁচ ভাই। তার মধ্যে বেঁচে আছেন মাত্র দু'জন। ছোট-রাজাবাবু থাকেন ভুবনেশ্বরে আর মেজো জন কলকাতায়। এখন তো আর প্রায় কেউ আসেই না। শুধু-শুধু বাড়িটা ফেলে রেখেছেন আর আমাদের মাইনে গুনছেন।"

"বাড়িটা বিক্রি করে দিচ্ছেন না কেন ?"

"এত বড় বাড়ি এই জঙ্গলের দেশে, কে কিনবে ? মেজো রাজাবাবু চেয়েছিলেন বাড়িটা গভর্নমেন্টকে দিয়ে দিতে, কলেজ বা হাসপাতাল করার জন্য। ছোট-রাজাবাবু তাতে রাজি নন। তাঁর টাকা চাই।"

"দুই ভাইতে ভাব আছে ?"

"রাজাবাবুদের মধ্যে খুব ভাব। ছোট-রাজাবাবু টাকা চাইলে মেজো-রাজাবাবু দিতে কখনও আপত্তি করেন না শুনেছি। বড়-রাজাবাবুর ছেলে, তিনিও থাকেন কলকাতা, সেই বড়-কুমারবাবুও মেজো-রাজাবাবুকে খুব ভক্তি করেন। তবে মেজো-রানীমা আর ছোট-রানীমার মুখ-দেখাদেখি বন্ধ। একবার হয়েছিল কী জানেন, ছোট-রানীমার এক ভাই এখানে দলবল নিয়ে শিকার করতে এসেছিল। তারপর এই বাড়িতে সে খুন হয়ে গেল !"

"তাই নাকি ? কে খুন করল ?"

"ধরা তো কেউ পড়েনি। লোকে বলে, মেজো-রাজাবাবুর ছেলে তখন এখানে ছিল, তার সঙ্গে ওই শালাবাবুর ঝগড়া হয়েছিল খুব, ওই মেজো-কুমারটি খুন করেছে।"

"পুলিশ-কেস হয়নি ?"

"এই সব বড়-বড় লোকদের ব্যাপারে কি পুলিশ কিছু করতে পারে, স্যার ? গল্প শুনেছি, কয়েক পুরুষ আগে, এই রাজাদেরই বংশের একজন তরোয়াল দিয়ে একজন পুলিশ ইন্‌সপেক্টরের মুণ্ডু কেটে ফেলেছিলেন এক কোপে। তাঁরও কোনও শাস্তি হয়নি। তিনি চলে গিয়েছিলেন গোয়াতে।"

"এই বাড়িতে তা হলে অনেক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে বলো !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। রাজা-রাজড়াদের ব্যাপার, খুন-জখম তো লেগেই ছিল এককালে !"

কাকাবাবু দেবলীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, "রাজাবাবু, রানীমা, বড়কুমার, এই সব শুনলে কীরকম মজা লাগে, না রে ? জমিদারি, নেটিভ স্টেট কবে উঠে গেছে, তবু এখনও অনেকে রাজা-রাজকুমার টাইটেল রেখে দিয়েছে। কলকাতার মতন শহরে এই সব লোকেরা পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও কেউ পাত্তা দেবে না ! সেজো-রাজাবাবুর ছেলেই তো তোর বাবার অফিসে চাকরি করে !"

শশাবাবু বলল, "এখানকার লোকেরা কিন্তু রাজাবাবুদের দেখলেই প্রণাম করে।"

কাকাবাবু বললেন, "এই বাড়িটায় এলে অনেকটা পুরনো আমলে ফিরে গেছি মনে হয়।"

এই সময় হঠাৎ একটা দরজা খোলার শব্দ হতেই সবাই চমকে তাকাল।

সেই দক্ষিণের কোণের ঘরটার দরজার দুটো পাল্লাই খুলে গেছে। সেখান থেকে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। পায়ে বোধহয় খড়ম পরা, খটখট শব্দে এদিকেই এগিয়ে আসতে লাগল।

কাকাবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। দক্ষিণের ঘরটা তালা দেওয়া ছিল, তবে কি তিনি পরে আবার তালা বন্ধ করতে ভুলে গেছেন ? কিংবা দুর্যোধনকে বলেছিলেন বন্ধ করতে ?"

তিনি নিজে ওই ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানা-বালিশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। কোনও মানুষজনের চিহ্নই ছিল না। কেউ কি লুকিয়ে ছিল ? প্রায় অসম্ভব সেটা। কেউ লুকিয়ে থাকলেও এখন এরকমভাবে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসবে কেন ?

রিভলভারটা ঘরের মধ্যে রয়েছে। কাকাবাবু চট করে সেটা নিয়ে আসবেন ভেবেও থেমে গেলেন। যে-লোকটি এগিয়ে আসছে, তাকে এবার অনেকটা স্পষ্ট দেখা গেল। একজন বেশ লম্বা, বৃদ্ধ লোক। মাথার চুল ও মুখের দাড়ি

ধপধপে সাদা। মনে হয় কোনও সন্ন্যাসী। লাল টকটকে ধুতি পরা, গায়ে একটা লাল চাদর, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

কাকাবাবু এক নজর তাকিয়ে দেখলেন, দেবলীনার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আর শশাবাবু চোখ দুটো গোল-গোল করে বলছে, "গু-গু-গু-গু-গুরুদেব!"

কাকাবাবু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কে ইনি? তুমি জানো?"

শশাবাবু বলল, "রা-রা-রা-রা-জাদের গুরুদেব! মাঝে-মাঝে আসেন। একশো বছরের বেশি বয়েস।"

"ওই ঘর থেকে কী করে এলেন?"

"জা-জা-জা-জা-নি না! ওরে বা-বা-বা-বা..."

বৃদ্ধটি অনেক কাছে চলে এসেছেন। তাঁর চোখ সামনের দিকে। এই তিনজনকে যেন তিনি দেখতেই পাচ্ছেন না।

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, "নমস্কার!"

বৃদ্ধটি একটি হাত তুলে কাকাবাবুর দিকে আশীর্বাদের ভঙ্গি করলেন। কিন্তু থামলেন না। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে নামতে লাগলেন। নীচে যাবার সিঁড়ি দিয়ে। তাঁর খড়মের শব্দ হতে লাগল খট্ খট্ খট্ খট্।

কাকাবাবুও এমন অবাক হয়ে গেছেন যে, তাঁর গলা দিয়েও আর কোনও শব্দ বেরোল না।

৫

সকাল আটটার সময় কাকাবাবু দেবলীনাকে ডেকে তুললেন। এর মধ্যে কাকাবাবুর স্নান করা, দাড়ি কামানো হয়ে গেছে। আগে নিজে এক কাপ চা-ও খেয়েছেন। আবার এক পট চা দিয়ে গেছে দুর্যোধন।

কাকাবাবু বললেন, "ওঠ দেবলীনা, দ্যাখ কী সুন্দর সকাল! উঠোনের দেবদারু গাছে একঝাঁক টিয়াপাখি এসে বসেছে!"

দেবলীনা চোখ খুলল, তার এখনও ঘুমের ঘোর লেগে আছে। সে যেন মনে করতে পারছে না কোথায় আছে। তারপরই ধড়ফড় করে উঠে বসল।

কাকাবাবু বললেন, "ট্যাঙ্কে জল ভরে দিয়েছে। বাথরুমে কলে জল পাবি। মুখ-টুক ধুয়ে আয়। তুই চা খাস তো?"

"হ্যাঁ খাব!"

"শশাবাবুকে ব্রেকফাস্ট বানাতে বলেছি, একটু বাদেই এসে যাবে!"

দেবলীনা বাথরুমে ঢুকতেই কাকাবাবু ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বাড়ির পেছন দিকেও অনেক দেবদারু গাছ। রাজাদের বোধহয় এই গাছের শখ ছিল। এখান থেকেও পুকুরটার একটা অংশ দেখা যায়। প্রায়

কুড়ি-পঁচিশটা বক বসে আছে সেখানে।

এক সময় তাঁর চোখে পড়ল মেঝেতে খানিকটা রক্ত শুকিয়ে আছে। কালকের সেই প্যাঁচাটার রক্ত। তিনি ভাবলেন, দুর্যোধনকে ডাকিয়ে জায়গাটা মুছিয়ে ফেলতে হবে। শোবার ঘরের মেঝেতে রক্ত পড়ে থাকা খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার।

প্যাঁচাটার জন্য তাঁর আবার দুঃখ হল। তিনি নিজেই যদি একটু ভাল করে দেখে নিতেন, তা হলে প্যাঁচাটা মরত না।

দেবলীনা মুখ ধুয়ে আসার পর কাকাবাবু চা ছেঁকে দিলেন তাকে। চামচে ভর্তি চিনি নিয়ে গুলতে লাগলেন টুং-টুং শব্দ করে।

দেবলীনা একটুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মতন তাকিয়ে রইল কাকাবাবুর মুখের দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, কাল রাত্তিরে কী হল ? আমরা কী দেখলুম ?"

কাকাবাবু বেশ হালকা মেজাজে বললেন, "কেন রে, কী দেখলি, তোর মনে নেই ? ভুলে গেলি এর মধ্যে ? কাল তো তুই জেগেই ছিলি !"

"ভুলিনি, মনে আছে। কিন্তু...কিন্তু ওই লোকটা কোথা থেকে এল ?"

"দক্ষিণের কোণের ঘরটা থেকেই তো বেরোতে দেখলাম, তাই না ?"

"কী করে বেরোল ? ও ঘরে কেউ ছিল না। সত্যিই তা হলে ভূত..."

কাকাবাবু হা-হা করে হেসে উঠলেন।

কাল রাতে সেই বৃদ্ধকে দেখার পর শশাবাবু শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। দুর্যোধনকে ডাকাডাকি করে সাড়া পাওয়া যায়নি। শশাবাবুর চোখে জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার পরেও সে আর ভয়ের চোটে নীচে যেতে চায়নি। সে শুয়েছিল কাকাবাবুর পাশের ঘরে। দেবলীনাকেও একা ঘরে শুতে দেওয়া হয়নি।

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "ভূত, তার সত্যি-মিথ্যে কী ? ভূত হলে ভূত, না হলে নয় ! আজ তোকে আমি ওর থেকে অনেক আশ্চর্য একটা জিনিস দেখাব ! সেটা দেখলে তুই এমন অবাক হয়ে যাবি..."

"না কাকাবাবু, তুমি বলো, ওই বুড়োটা কি মানুষ না ভূত ?"

"তা বলা শক্ত। তবে, ভূত কি কখনও সন্ন্যাসী সাজে ? রুদ্রাক্ষের মালা পরে ? আর যদি তা-ও হয়, একটা বুড়ো-সন্ন্যাসীর ভূত আমাদের কী ক্ষতি করবে ? তাকে দেখে আমাদের ভয় পাওয়ার কী আছে ?"

"আমি ভয় পেয়েছিলুম। আমি এখনও বুঝতে পারছি না।"

"তবে তোকে সত্যি কথা বলি। আমারও এক সময় ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠেছিল। আমি, রাজা রায়চৌধুরী, জীবনে কত বিপদে-আপদে পড়েছি, কখনও ঠিক ভয় পাইনি, অথচ কাল রাত্রে ওই সন্ন্যাসীকে দেখে আমারও প্রায় কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল !"

"দক্ষিণের কোণের ঘরের দরজা বন্ধ ছিল না ?"

"হ্যাঁ, বন্ধ তো ছিল ঠিকই !"

খাবারের ট্রে হাতে নিয়ে এসে শশাবাবু বলল, "স্যার, আপনার সঙ্গে একটা লোক দেখা করতে এসেছে।"

কাকাবাবু বললেন, এখানে আমার কাছে কে আসবে ? নিশ্চয়ই দারুকেশ্বর। পাঠিয়ে দাও, পাঠিয়ে দাও !"

দারুকেশ্বর আজ পাজামার ওপর একটা সুবজ পাঞ্জাবি পরে এসেছে, সেই পাঞ্জাবির গায়ে সংস্কৃতে কীসব যেন লেখা। তার মুখের দাড়ি ও মাথার বাবরি চুল বেশ তেল-চুকচুকে ও সুন্দরভাবে আঁচড়ানো।

একগাল হেসে সে বলল, "এই যে রায়চৌধুরীবাবু, কেমন আছেন ? কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়েছিল তো ? আপনাদের খবর নিতে এলাম। ...কেমন আছ মামণি ?"

কাকাবাবু বললেন, "আসুন, আসুন, এখানে এসে বসুন। চা খাবেন তো ? কাল রাত্তিরেই ভূতদর্শন হয়ে গেল।"

"তাই নাকি ? কী রকম, কী রকম ? শুনি শুনি।"

"একেবারে চোখের সামনে জলজ্যান্ত ভূত দেখেছি। অবিশ্বাস করার কোনও উপায় নেই। আচ্ছা দারুকেশ্বরবাবু, আপনার ভূত ধরার ফি কত ? মনে হচ্ছে, আপনাকে কাজে লাগাতে হবে।"

দারুকেশ্বর প্রাণখোলা দরাজ গলায় হেসে নিল খানিকটা। তারপর বলল, "কাল ট্রেনে কীরকম জমিয়েছিলুম, সেটা বলুন ! আমি মশাই ট্রেনে চুপচাপ বসে থাকতে ভালবাসি না। আপনি কি ভেবেছিলেন আমি সত্যি-সত্যি ভূত ধরার ব্যবসা করি ? আমার পদবি ওঝা শুনলেই সবাই ভাবে, হয় আমি ভূতের ওঝা, কিংবা সাপের ওঝা। তাই আমি কখনও ভূতের গল্প, কখনও সাপের গল্প শুরু করি। আসলে আমি ওষুধের ফেরিওয়ালা। আয়ুর্বেদিক ওষুধ বিক্রি করি, তাই প্রায়ই ট্রেনে যেতে হয় এখানে-সেখানে। তবে আমি ভূতের গন্ধ পাই ঠিকই।"

দেবলীনা বলল, "কিন্তু কাল আমরা সত্যিই যে একজনকে দেখলুম।"

"কী দেখলে বলো তা মামণি।"

"দক্ষিণের কোণের ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল। সেখান দিয়ে একটি বুড়ো সন্ন্যাসী বেরিয়ে এল রাত্তিরবেলা, আমাদের চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং ! ভেরি ইন্টারেস্টিং ! চোরেরা অনেক সময় সাধু সাজে শুনেছি, কিন্তু ভূতও যে সাধু হয়, তা কখনও শুনিনি !"

কাকাবাবু বললেন, "শশাবাবুদের মতে, ওই বৃদ্ধটি হচ্ছেন এই রাজবংশের গুরুদেব। একশো বছরের বেশি বয়েস। উনি মরে গেছেন না বেঁচে আছেন,

তা কেউ জানে না। তবে উনি নাকি সশরীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন। হঠাৎ দেখা দেন, হঠাৎ মিলিয়ে যান। একে ঠিক ভূত বলা যায় কি ?"

দারুকেশ্বর বলল, "স্যার, আপনি নিশ্চয়ই আমার থেকে অনেক বেশি লেখাপড়া জানেন। আপনিই বলুন, জ্যান্ত মানুষ কি কখনও অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে ?"

কাকাবাবু এ-কথার উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা দারুকেশ্বরবাবু, আপনি যে আমাদের দক্ষিণের কোণের ঘরটা সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন, তার কারণ কী ?"

"ওই ঘরটা সম্পর্কে অনেক রকম গল্প আছে। বছর পনেরো আগে রাজাদের এক মেয়ে, তার নাম ছিল চম্পা, ওই ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।"

"সেই মেয়েটিও অদৃশ্য হয়ে যায় ? মারা যায়নি ওই ঘরে ?"

"কেউ বলে মরে পড়ে ছিল। কেউ বলে তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যায়নি। অথচ দরজা বন্ধ ছিল ভেতর থেকে। অনেকদিন আগের কথা তো ! একটা কিছু সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হয়েছিল ঠিকই। তারপরেও নাকি অনেকদিন ওই ঘরের মধ্যে একটি মেয়ের কান্নার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেছে রাত্তিরবেলা। ধুপধাপ শব্দও শোনা গেছে।"

"আপনি এ-বাড়িতে এসেছেন কখনও ?"

"হ্যাঁ, এসেছি কয়েকবার ! এক সময় অনেক মানুষের আনাগোনা ছিল। বছর দশ-বারো হল বিশেষ কেউ আর আসে না।"

"চলুন, তা হলে দক্ষিণের কোণের ঘরটা একবার দেখা যাক।"

তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট শেষ করে কাকাবাবু উঠে পড়লেন। বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা বার করে ভরে নিলেন পকেটে। ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

লম্বা টানা বারান্দা। সাদা ও কালো পাথরে চৌখুপি কাটা। এখন ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছে সেখানে। কাকাবাবুর ক্রাচের তলায় রবার লাগানো, তাই শব্দ হয় না। কাল রাতে সেই বৃদ্ধ সাধু যখন এখান দিয়ে গিয়েছিল, তখন খট্‌খট্‌ শব্দ হচ্ছিল। এখন শুধু কাকাবাবু ও দারুকেশ্বরের চটির শব্দ, দেবলীনা খালি পায়ে এসেছে।

দক্ষিণের কোণের ঘরটার দরজায় এখন তালা লাগানো।

কাকাবাবু সেই তালাটা ধরে বললেন, "এটা একটা টিপ-তালা। খুলতে চাবি লাগে। বন্ধ করার সময় লাগে না। কাল আমি নিজের হাতে চাবি দিয়ে তালাটা খুলেছিলুম। তারপর বন্ধ করেছি কি করিনি, তা মনে নেই। তাতে কিছু যায় আসে না। অনেক পুরনো তালা, এর ভেতরের কলকব্জা অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। এই দেখুন।"

কাকাবাবু দরজার পাল্লা দুটো ধরে জোরে টানলেন। তালাটা আপনিই খুলে

গেল।

তিনি দেবলীনাকে বললেন, "বুঝলি, দরজায় এই তালা লাগানো আর না-লাগানো সমান ! সুতরাং দরজাটা খুলে যাওয়া আশ্চর্য কিছু না। কিন্তু এরপর তোদের সত্যিকারের একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাব !"

কাকাবাবুই আগে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, দেবলীনা আর দারুকেশ্বর দরজার কাছ থেকে উঁকি মারল।

কাল সন্ধেবেলা যে-রকম দেখা গিয়েছিল, ঘরটা এখনও ঠিক সেই রকমই আছে। দু'দিকের দেওয়ালে লেপ-তোশক-বালিশের পাহাড়।

কাকাবাবু বললেন, "রাত্তিরে আমি আর এ-ঘরে আসিনি। বেশ একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলুম। কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারছিলুম না ঘটনাটার। সারা রাত ভাল করে ঘুমই হল না। সকালবেলা মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। নিজের চোখে যা দেখেছি, তা কক্ষনো ভুল হতে পারে না। ঘটনাটা নিশ্চয়ই ঘটেছে। এবং তার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা থাকতেই হবে ! তাই ভোরবেলা আমি এই ঘরে এসে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি। একটা জিনিস দেখে আরও বেশি চমকে উঠেছি। এবার তোমাদের সেটা দেখাব।

কাকাবাবু একদিকের দেওয়ালের বালিশ-তোশক টেনে নামাতে লাগলেন। তাঁর পাশে এসে দারুকেশ্বরও হাত লাগাল, সব জমা হতে লাগল পায়ের কাছে। একটু বাদে দেখা গেল দেওয়ালের গায়ে একটি ছবির ফ্রেম। বেশ বড়। আস্তে আস্তে দেখা গেল ছবিটা। একটি কিশোরী মেয়ের অয়েল পেইন্টিং। লাল রঙের ফ্রক পরা চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে, মাথার চুলে রিবন বাঁধা, অবাক-অবাক চোখের দৃষ্টি।

দারুকেশ্বর অস্ফুট গলায় বলল, "চম্পা ! চম্পার ছবি !"

দেবলীনা বলল, "এ কী ! এ তো আমার ছবি !"

দারুকেশ্বর পাশ ফিরে দেবলীনাকে এক ঝলক দেখে নিয়ে বলল, "তাই তো ! এ-ছবি তো হুবহু এই মামণির মতন। এ কী করে সম্ভব হল ?"

কাকাবাবু বললেন, "পনেরো বছর আগে মারা গেছে কিংবা হারিয়ে গেছে যে চম্পা, তার সঙ্গে দেবলীনার মুখের কী আশ্চর্য মিল ! ঠিক যেন দেবলীনারই ছবি এঁকে রেখেছে কেউ !"

দারুকেশ্বর বলল, "ছবিটা পুরনো, অনেকদিন আগে আঁকা।"

কাকাবাবু বললেন, "এ-বাড়ির অন্য ঘরেও বেশ-কিছু ছবি আছে, আমি দেখেছি। আমরা যে-ঘরে শুয়েছি, সে-ঘরের দেওয়ালেও একটা সাদা চৌকো জায়গা, সেখানে একটা ছবি টাঙানো ছিল মনে হয়। কেউ খুলে নিয়েছে। রাজাদের কারও ছবির শখ ছিল।

দারুকেশ্বর বলল, "চম্পাকে আমিও দু'একবার দেখেছি। অনেকদিন আগের কথা, এখন মনে পড়ছে। ঠিকই তো, এই মামণির চেহারার সঙ্গে খুব মিল

ছিল। যেন দুটি যমজ বোন, কিংবা এই দেবলীনা-মামণিই সেদিনের চম্পা !"

কাকাবাবু বললেন, "চম্পা বেঁচে থাকলে এখন তার বয়েস অন্তত তিরিশ বছর হবার কথা।"

দেবলীনার ঠোঁট কাঁপছে। ছবিটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে বলল, "কাকাবাবু, এই মেয়েটা, এই মেয়েটাই আমায় মাঝে-মাঝে ডাকে।"

দারুকেশ্বর বলল, "আশ্চর্য ! এরকম কী করে হয় ! এমন হতে পারে ?"

কাকাবাবু শেকস্‌পিয়ারের হ্যামলেট নাটক থেকে আবৃত্তি করলেন, "দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ, হোরেসিও, দ্যান আর ড্রেম্‌ট অব ইন ইয়োর ফিলসফি !' জীবনে এরকম কিছু-কিছু আশ্চর্য ব্যাপার আজও ঘটে। এক কোটি বা দশ কোটি মানুষের মধ্যে একজনের সঙ্গে আর-একজনের চেহারার হুবহু মিল থাকা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু চম্পা যে-ঘর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল, সেই ঘরে চম্পারই মতন দেখতে দেবলীনা ফিরে এসেছে এতদিন বাদে, এটাই একটা মহা আশ্চর্যের ব্যাপার !"

দারুকেশ্বর বলল, "আমি এখনও যে বিশ্বাস করতে পারছি না।"

কাকাবাবু ছবিটার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন, ছবিটা পুরনো, এটা দেবলীনাকে দেখে আঁকা হয়নি। চম্পারই ছবি।"

দারুকেশ্বর বলল, "চোখ দুটো দেখলে মনে হয়, ঠিক যেন জীবন্ত !"

কাকাবাবু বললেন, "আপাতত ছবিটা ঢেকে রাখাই ভাল। দুর্যোধন আর শশাবাবুকে কিছু বলবার দরকার নেই। শশাবাবু চম্পাকে কখনও দ্যাখেনি। দুর্যোধন দেখেছে বটে, সে একবার বলেওছিল, চম্পার সঙ্গে দেবলীনার মিল আছে, কিন্তু ঠিক কতখানি যে মিল, তা তার মনে নেই।"

কাকাবাবু ছবিটাকে দেওয়াল থেকে একবার খুলে নিলেন, তারপর পেছনের দেওয়ালে টোকা মারলেন কয়েকবার। নিরেট দেওয়াল, কোনও শব্দ হল না।

কাকাবাবু দারুকেশ্বরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আগেকার দিনে এইসব পুরনো রাজবাড়িতে হঠাৎ শত্রুর আক্রমণ থেকে পালাবার ব্যবস্থা রাখার জন্য গুপ্ত-ঘর বা গোপন সুড়ঙ্গ থাকত। এ-বাড়িতে সে-রকম কিছু আছে কি না, জানেন কি ?"

দারুকেশ্বর ঠোঁট কামড়ে একটুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "নাঃ, সেরকম কিছু শুনিনি।"

"চম্পা যদি এ-ঘর থেকে উধাও হয়ে থাকে, তা হলে এই ঘরেরই কোথাও কোনও গোপন সুড়ঙ্গ-পথে এসে কেউ তাকে নিয়ে গেছে, এরকম মনে করাই তো স্বাভাবিক তাই না ? তখন খোঁজাখুঁজি করে দেখা হয়নি ?"

"এই ঘরের সঙ্গে একটা বাথরুম আছে। তার জানলা ভাঙা ছিল। পুলিশ এসে বলেছিল, ওই জানলা দিয়েই কেউ ঢুকে চম্পাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, তারপর মেরে ফেলেছে। আবার কারও-কারও ধারণা, যুগলকিশোরের

প্রেতাত্মাই চম্পাকে ভুলিয়েভালিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে, প্রতিশোধ নেবার জন্য।"

"যুগলকিশোর কে?"

"ছোট-রানীমার ভাই। সে খুন হয়েছিল এই বাড়িতেই!"

"হুঁ! চম্পার দেহ আর পাওয়া যায়নি?"

"নাঃ! অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছে, পুকুরে জাল ফেলা হয়েছে, জঙ্গলে একশোজন লোক লাগানো হয়েছিল। এই রাজবংশের একজন গুরুদেব চম্পাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি এ-বাড়িতে উপস্থিত থাকতেও চম্পার ওরকম পরিণতি হল বলে তিনি দুঃখে, অনুশোচনায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। আপনারা কাল বোধহয় তাঁকেই দেখেছেন। জীবিত না প্রেতাত্মা দেখেছেন, তা বলতে পারব না!"

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। চম্পার ছবিটাকে একটা তোশকের ভাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি এগিয়ে গিয়ে খুলে ফেললেন, বাথরুমের দরজাটা।

পেছন ফিরে বললেন, "ভোরবেলা আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে গেছি। বাথরুমের জানলা এখন আর ভাঙা নয়, তাতে শিক বসানো আছে। জানলা ভেতর থেকে বন্ধ। কাল রাতে যে-বৃদ্ধটি এ-ঘর থেকে বেরিয়েছিল, সে জানলা দিয়ে ঢোকেনি। সে অন্য কোনও পথে এসেছিল। যাকগে, ব্যস্ততার কিছু নেই, সেটা পরে দেখলেও চলবে!"

দেবলীনা থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওই মেয়েটা সত্যি মরে গেছে? ওকে কেন মেরে ফেলেছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো জানি না। অনেকদিন আগেকার ব্যাপার, এখন আর বোধহয় জানাও যাবে না! চল্‌, এ-ঘর থেকে বাইরে যাই!"

বারান্দার চেয়ারে এসে বসবার পর দারুকেশ্বর বলল, "এর পরেও আপনারা এ-বাড়িতে থাকবেন?"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "কেন, থাকব না কেন? না থাকার কী আছে? বেশ তো চমৎকার বাড়ি। কী রে, দেবলীনা, তোর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না?"

"দেবলীনা বলল, "হ্যাঁ, থাকব।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার তো দারুণ এক্সাইটিং লাগছে, আজ রাত্তিরে যদি সেই বুড়ো সন্ন্যাসীকে দেখা যায়, তা হলে আজ আর ঘাবড়ালে চলবে না, সোজা গিয়ে পা চেপে ধরব। দেখতে হবে সে সত্যি-সত্যি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে কি না!"

দারুকেশ্বর বলল, "আপনার সাহস আছে দেখছি! দিনের বেলা ভয় কিছু নেই, কিন্তু রাত্তির হলে এসব জায়গায় আমার গা-ছমছম করে। আমি লোকের

কাছে ভূত ধরার গল্প করি বটে, কিন্তু নিজে বেশ ভূতের ভয় পাই। এক-এক সময় এমন বিচ্ছিরি গন্ধ ছাড়ে এরা...”

“আপনি ওই দক্ষিণের ঘরটায় কিছু গন্ধ-টন্ধ পেলেন ?”

“না, তা পাইনি। দিনের বেলা অনেক সময়ই পাওয়া যায় না। তা হলে আমি এখন উঠি। আমাকে একটু জঙ্গলের দিকে যেতে হবে শেকড়-বাকড় খুঁজতে। আমি তো ভেষজ ওষুধ বানাই !”

“কিসের ওষুধ বানান ?”

“এই পেটের অসুখ, মাথা গরম, বুক ধড়ফড়, কান কটকট, আরও অনেক রোগের ওষুধ আছে।”

“চলুন তা হলে আপনার সঙ্গে আমরাও একটু জঙ্গলে ঘুরে আসি। শুধু শুধু বাড়িতে বসে থেকে কী করব ?”

“কিন্তু আমি সাইকেলে এসেছি। আমার সঙ্গে আপনারা কী করে যাবেন ?”

“তা হলে তো মুশকিল ! হাঁটা-পথে অনেক দূর হবে, তাই না ? আমাদের একটা গাড়ি ভাড়া করে রাখা উচিত ছিল। আপনাকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিলে আপনি শহর থেকে আমাদের জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করে পাঠিয়ে দিতে পারবেন ?”

“আজ তো আর হবে না। কাল সকালে আমি নিজেই একটা গাড়ি জোগাড় করে আনব।”

দারুকেশ্বরের সঙ্গে দেবলীনা আর কাকাবাবুও নীচে নেমে এলেন। রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক-ছ্যাঁক রান্নার আওয়াজ আসছে। উঠোনে মাটি কোপাচ্ছে দুর্যোধন। দেবদারু গাছের মাথায় এখনও অনেক টিয়াপাখি টিটি করে ডেকে খেলা করছে নিজেদের মধ্যে। বড় গেটটার ওপরে বসে আছে একটা শঙ্খচিল।

কাকাবাবু দুর্যোধনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, “ও-ই এখানকার দরোয়ান-কাম মালি-কাম জল তোলার লোক। তবে ওর নাম দুর্যোধন না হয়ে কুম্ভকর্ণ হওয়া উচিত ছিল। কাল রাতে ওকে এত ডাকলুম, কিছুতেই উঠল না ! যে-দরোয়ান এত ঘুমোয়, সে কী করে বাড়ি পাহারা দেবে ?”

দারুকেশ্বর বলল, “এ-বাড়ি থেকে কী-ই বা নেওয়ার আছে ? টাকা-পয়সা তো কিছু নেই, বড়-বড় খাট, চেয়ার, টেবিল, কে-ই বা বয়ে নিয়ে যাবে ! রাজারা বাড়িটা বিক্রি করতে চান, কিন্তু খদ্দের পাচ্ছেন না। একেই তো এত বড় বাড়ি, তার ওপর বদনাম আছে। শেষ পর্যন্ত কী হবে জানেন, আর দু'চার বছরের মধ্যেই দেখবেন, এটা একেবারে পোড়োবাড়ি হয়ে গেছে। বেশির ভাগ রাজবাড়িগুলোর এই দশাই হয়। কুচবিহারের রাজবাড়ি দেখেছেন ? দেখলে চোখে জল আসে !”

বড় গেটের মধ্যে ছোট গেট দিয়েই ওদের বেরোতে হল বাইরে। বড় গেটটা

যে বহুদিন খোলা হয়নি, তা বোঝা যায়। দারুকেশ্বর সাইকেলে উঠে পড়ে হাত নেড়ে চলে গেল।

কাকাবাবু জিভ দিয়ে চুক-চুক শব্দ করে বললেন, "দুর্যোধনেরও একটা সাইকেল আছে না ? ইস, এককালে আমিও খুব ভাল সাইকেল চালাতুম রে, দেবলীনা ! এখন খোঁড়া পায়ে আর পারি না। না হলে তোকে ক্যারি করে আমরা সাইকেলেই ঘুরে আসতে পারতুম জঙ্গলে।"

"আমি সাইকেল চালাতে জানি, কাকাবাবু। আমি তোমাকে ক্যারি করে নিয়ে যাব ?"

"যাঃ, তুই আমার এত বড় শরীরটা টানবি কী করে ? সে হয় না।"

"আমার সাইকেল চলাতে ইচ্ছে করছে। আমি তা হলে একটু একা ঘুরে আসব, কাকাবাবু ?"

কাকাবাবু দেবলীনার মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "যেতে নিষেধ করা আমার স্বভাব নয়। তুই একলা যেতে চাইছিস, কোনও বিপদে-টিপদে পড়বি না তো ?"

"দিনের বেলা আবার কী বিপদ হবে ? বেশি দূরে যাব না !"

"ঠিক আছে, ঘুরে আয়। একটা কথা শোন, সেই যে মেয়েটা তোকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তাকে কি সত্যি চম্পার মতন দেখতে ?"

"এক ঝলকের জন্য শুধু দেখতে পাই। অনেকটা ওই রকম।"

"এবারে যদি সেরকম দেখতে পাস, তুই একলা একলা তার পেছনে ছুটে যাবি না। আমাকে ডাকবি। কী, মনে থাকবে তো ?"

"হ্যাঁ, তোমায় ডাকব।"

"তুই কী রকম সাইকেল চালাতে পারিস, দেখি !"

দুর্যোধনের সাইকেলটা গেটের পাশেই হেলান দিয়ে রাখা। দেবলীনা বেশ সাবলীলভাবে তাতে চেপে এক পাক ঘুরে এল। কাকাবাবু প্রশংসার চোখে তাকিয়ে বললেন, "বাঃ, বেশ ভালই চালাতে পারিস রে। ঘুরে আয় তা হলে। দেরি করে আমায় চিন্তায় ফেলিস না যেন ! আমি ততক্ষণ পুকুরধারটা ঘুরে আসি।"

দেবলীনা জঙ্গলের পাশের রাস্তাটা দিয়ে একটু বাদেই চলে গেল চোখের আড়ালে।

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে হাঁটতে লাগলেন বাড়ির পেছন দিকে। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছে, কোথাও কোথাও মাটি বেশ নরম, তাঁর ক্রাচ বসে যাচ্ছে। এদিকে ওদিকে কিছু অস্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন। দুর্যোধন শশাবাবুরা বাড়ির পেছন দিক দিয়েই যাতায়াত করে। পেছন দিকে অনেক জায়গায় পাঁচিল ভেঙে পড়েছে। একতলার একটা ঘরের দরজা আধখানা ভাঙা। কুকুর-বেড়াল-শেয়াল অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে।

পুকুরটা চৌকো, কিন্তু খুব বেশি বড় নয়। বহুদিন পরিষ্কার করা হয়নি, জলের মধ্যে শ্যাওলা আর শাপলা অনেক। মাঝপুকুরে একটা মাছ ঘাই মারল, তা দেখে কাকাবাবুর মনে পড়ল, ছিপ-বঁড়শি আছে কি না তা খোঁজ করা হয়নি শশাবাবুদের কাছে। এত বক বসে আছে যখন, তখন পুকুরটায় নিশ্চয়ই বেশ মাছ আছে।

একটা বড় বাঁধানো ঘাট, তার দু'পাশে পাথরের নারীমূর্তি বসানো। দুটো মূর্তিরই নাক ভাঙা, হাত ভাঙা। ঘাটের সিঁড়িগুলোও ভেঙে পড়েছে অনেক জায়গায়। দারুকেশ্বর ঠিকই বলেছে। আর কিছুদিন পরেই এই রাজবাড়িটা পোড়োবাড়ি হয়ে যাবে।

পুকুরের এক ধারে সাত-আটখানা মাটির বাড়ি। দেখলেই বোঝা যায়, ওই সব বাড়িতে এখন কোনও লোক থাকে না। রাজারা যখন নিয়মিত আসতেন, তখন তাঁদের ঠাকুর-চাকর-ধোপা-নাপিত লাগত নিশ্চয়ই, তাদের জন্য ওইসব বাড়ি বানানো হয়েছিল। এখন নিশ্চয়ই তারা শহরে চলে গেছে। এখন যে তিনজন কর্মচারী আছে, তারাও ঠিকমতন মাইনে পায় কি না কে জানে! মাইনে বন্ধ হলেই ওরাও পালাবে!

শিবমন্দিরটা পুকুরের ঠিক ডান কোণে। পুজো-টুজো বন্ধ হয়ে গেছে অনেক দিনই। মন্দিরের গা দিয়ে একটা বটগাছের চারা উঠে মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এই বটগাছটাই একদিন মন্দিরটা গুঁড়ো করে ফেলবে।

মন্দিরের চাতালে উঠে ভেতরে তাকিয়ে কাকাবাবু অবাক হলেন। মন্দিরটার তুলনায় শিবলিঙ্গটা বিরাট। প্রায় দু'জন মানুষের সমান গোল আর ছ'ফুটের মতন লম্বা। মন্দিরের ভেতরটা অন্ধকার। জানলা-টানলা কিছু নেই।

কাকাবাবু মন্দিরের মধ্যে ঢুকে ভাল করে দেখলেন। এককালে একটা জানলা ছিল, পরে কোনও কারণে ইট দিয়ে গেঁথে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভেতরে একটা টকটক গুমোট গন্ধ। মেঝেতে এখানে-সেখানে জল, হয়তো বৃষ্টির সময় কোনও ফাটল দিয়ে জল পড়ে।

খানিকক্ষণ শিবলিঙ্গটা দেখার পর কাকাবাবু তার সামনে বসে পড়লেন। কী ভেবে সেটার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলেন শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে। খুব জোরে একটা চাপ দিতেই শিবলিঙ্গটা সরে গেল পেছনের দিকে। তার নীচে দেখা গেল একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ।

কাকাবাবুর মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। তাঁর অনুমান ঠিক হয়েছে। রাজবাড়ি থেকে তিনি গোপন সুড়ঙ্গটা খুঁজে পাননি বটে, কিন্তু এটাই সেই সুড়ঙ্গের বেরোবার পথ! পালাবার পক্ষে এই তো আদর্শ জায়গা!"

কাকাবাবু একবার ভাবলেন, পরে এক সময় দেবলীনা আর দারুকেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে এসে, ওদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে, তারপর তিনি এই সুড়ঙ্গের ভেতরটায় ঢুকে দেখবেন। এই রকম অন্ধকার ঠাণ্ডা জায়গায় সাপ থাকতে

পারে। আরও কিছু গণ্ডগোল থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। একা-একা ঢোকা ঠিক হবে না।

কিন্তু তিনি কৌতূহল সামলাতে পারলেন না। এক্ষুনি দেখতে ইচ্ছে হল। ক্রাচ দুটো রেখে দিয়ে তিনি সুড়ঙ্গের মধ্যে পা বাড়ালেন।

৬

ঢং ঢং ঢং ঢং করে ছুটির ঘন্টা বেজে গেল। সন্তুর তখনও তিন-চার লাইন লেখা বাকি। সন্তু মুখ তুলে একবার দেখে নিল, প্রোফেসর সেন সব ছাত্রদের কাছ থেকে খাতা নিয়ে নিচ্ছেন। সন্তু বসেছে একেবারে পেছনে, তার কাছে পৌঁছতে এক-দু' মিনিট সময় লাগবে। সে ঝড়ের বেগে লিখতে লাগল।

প্রোফেসর সেন যখন তার কাছে এসে বললেন, "টাইম ইজ ওভার," সন্তু বলল, "এই যে হয়ে গেছে, স্যার!" শেষ বাক্যটা লিখে সে তলায় একটা জোরে দাগ কাটল! বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। যাক, শেষ করা গেছে!

জোজো দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। তার শেষ হয়ে গেছে মিনিট-পাঁচেক আগেই। সে সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "কেমন হল রে?"

সন্তু বলল, "মোটামুটি! তোর?"

জোজো বলল, "সব কোশ্চেনগুলো তো আমার জলের মতন জানা। একশোর মধ্যে একশো নম্বর পাওয়া উচিত। অরিন্দম বেচারির ভাল হয়নি, ও মন খারাপ করে বাড়ি চলে গেছে।"

সন্তু বলল, "অরিন্দমটা বরাবরই নার্ভাস টাইপের। এইসব পরীক্ষা নিয়ে এত ঘাবড়াবার কী আছে?"

"তুই গুড নিউজ শুনেছিস, সন্তু? আমাদের বাকি পরীক্ষাগুলো বারো দিন পিছিয়ে গেছে!"

"পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে? তার মানে?"

"দ্যাখ না, বাইরে নোটিস দিয়েছে। কাল শুক্রবার, কাল আমাদের কিছু নেই। শনিবার অন্য কী একটা ছুটি। সোমবার থেকে এখানে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার সিট পড়েছে। ওদেরটা সেই গত মাসে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল না? সেটা এখন হবে, আমাদেরটা পিছিয়ে গেল!"

জোজোর কথায় চট করে বিশ্বাস করা যায় না। সন্তু নিজের চোখে নোটিস বোর্ড দেখতে গেল। জোজো এটা বানিয়ে বলেনি, নোটিস বোর্ডের সামনে অনেক ছাত্র ভিড় করে আছে, অনেকেই বেশ খুশি হয়েছে।

সন্তুর বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে গেল। পরীক্ষা মাঝ পথে বন্ধ হয়ে গেলে তার মোটেই ভাল লাগে না। শেষ হলেই চুকে যায়। তা ছাড়া, এই পরীক্ষার

কারণে তার এবার কাকাবাবুর সঙ্গে যাওয়া হল না ! কোনও মানে হয় !

জোজো বলল, "আমার ভালই হল, বাবা পরশুদিন দামাস্কাস যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল, পরীক্ষার জন্য যাওয়া হচ্ছিল না। এবারে ঘুরে আসব।"

"তুই এই ক'দিনের জন্য দামাস্কাস যাবি ?"

"হ্যাঁ। প্লেনে যাব, প্লেনে ফিরব, মাঝখানে থাকব তিনদিন। দামাস্কাসের শেখ বাবাকে হাত দেখাতে চেয়েছেন। বাবার দেওয়া আংটি পরে এই শেখ জগলুল পাশা তার ভাইয়ের হাতে গুলি খেয়েও বেঁচে গিয়েছিল। বাবাকে খুব ভক্তি করে। ফেরার পথে লণ্ডনেও থেকে আসতে হবে দু'দিন।"

"দামাস্কাস থেকে ফেরার পথে বুঝি লন্ডন পড়ে ?"

"একটু ঘুরে আসতে হবে অবশ্য। কিন্তু উপায় নেই। ইংল্যান্ডের প্রিন্স চার্লস আমার বাবার কাছে জানতে চেয়েছেন, উনি কবে সিংহাসনে বসবেন। ওঁর মায়ের তো রিটায়ার করার কোনও লক্ষণ নেই ! তুই জানিস, উইম্বলডনে খেলতে যাবার আগে প্যাট ক্যাশ আমার বাবার কাছ থেকে একটা মাদুলি নিয়ে গেছেন ? সেইজন্যই তো জিতলেন। ওঁর মা অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাদের বাড়িতে এক গাদা কনডেন্সড মিল্ক-এর টিন পাঠিয়েছেন।"

"শুধু কনডেন্সড মিল্ক ?"

"অস্ট্রেলিয়াতে তো আর কিছু পাওয়া যায় না। আর একজোড়া ক্যাঙারু পাঠাতে চেয়েছিলেন, তা নিয়ে আমরা কী করব !"

"চল জোজো, আজ আমরা একটা সিনেমা দেখি। ই. টি. দেখবি ?"

"ই. টি. ? ও তো পুরনো ছবি। আমার তিনবার দেখা। এখানে নয়, ফরেনে। প্রথমবার যখন কনকর্ড প্লেনে চেপে ফ্রান্স থেকে আমেরিকা যাই, ওরা বাবাকে আর আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল, তখন প্লেনেই ই. টি. দেখাল। তারপর আর একবার মস্কো ওলিম্পিকের বছরে..."

সন্তু বুঝল, আজ জোজোর কল্পনাশক্তি ওভারটাইম খাটতে শুরু করেছে। মাঝপথে তাকে বাধা দিয়ে সন্তু বল, "তা তো বুঝলুম, কিন্তু তুই আজ আমার সঙ্গে যাবি কি না, সেটা বল !"

জোজো অবহেলার সঙ্গে বলল, "যেতে পারি। আর একবার দেখলে ক্ষতি নেই। কোন্ হলে হচ্ছে। গ্লোবে ? ঠিক আছে, তোকে টিকিটও কাটতে হবে না। ওই হলের ম্যানেজার আমার ছোটকাকার আপন বন্ধু !"

"ওসব চলবে না, জোজো। তোর ছোটকাকার আপন বন্ধু বা পরের বন্ধু যা-ই হোন, কারও কাছে অকারণ ফেভার চাওয়া আমি পছন্দ করি না। আমার কাছে পয়সা আছে, টিকিট কাটব !"

বড় রাস্তায় এসে ওরা ট্রামে চাপল। খানিকটা ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। রাস্তায় লোকের খোলা ছাতা হাত থেকে উড়ে গিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল

মাটিতে। একটা বেলুনওয়ালার হাত ফসকে চলে গেল এক গোছা বেলুন। কোনও একটা দোকানের সাইনবোর্ড খসে পড়ল ঝনঝন শব্দে।

সন্তুদের সামনের সিটে একজন লোক আর-একজনকে বলল, "গত সপ্তাহে ওড়িশায় গিয়ে কী ঝড়ের মুখে পড়েছিলুম রে বাবা! যাজপুর থেকে কেওনঝড় যাচ্ছিলুম বাসে, রাস্তায় এমন ঝড় উঠল, বড়-বড় গাছ ভেঙে পড়ল..."

সন্তু চমকে উঠল। সেই মুহূর্তে সে কাকাবাবুদের কথা ভাবছিল, আর ঠিক তখনই আর-একটা লোকের মুখে কেওনঝড়ের নাম শোনা গেল।

কাকাবাবুরা এখন কেওনঝড়ে কী করছেন কে জানে! কাকাবাবু এবার সঙ্গে অনেক বই নিয়ে গেছেন। বলেছেন যে, গাছতলায় শুয়ে-শুয়ে বই পড়বেন। দেবলীনাটা দিব্যি সঙ্গে চলে গেল, সন্তুর যাওয়া হল না! কেওনঝড়ে রোজ ঝড়বৃষ্টি হলে অবশ্য আর ওঁদের গাছতলায় শুয়ে বই পড়া হবে না!

এসপ্লানেড পৌঁছবার আগেই বৃষ্টি নেমে গেল বড়-বড় ফোঁটায়। ট্রাম থেকে নেমে জোজো আর সন্তু দৌড় মারল সিনেমা হলের দিকে। কাউন্টারের সামনে যখন পৌঁছল, তখন দুটো মাত্র টিকিটই বাকি আছে।

সিনেমাটা দেখতে দেখতে সন্তুর আরও মন খারাপ হয়ে গেল। এই সব সুন্দর দৃশ্য দেখলেই ওইসব জায়গায় চলে যেতে ইচ্ছে করে। অন্য কোনও গ্রহের এরকম একটি প্রাণীর সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব হয়, যদি তার সঙ্গে একবার মহাশূন্যে চলে যাওয়া যায়...মানুষ আর কতদিন বাদে অন্য-অন্য গ্রহে সহজে যাতায়াত করতে পারবে?"

শো ভাঙবার পর সে জোজোকে বলল, "কাকাবাবুরা কেওনঝড়ে গেছেন, জানিস? এবারে আমার আর যাওয়া হল না!"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "কেন যাওয়া হল না? পরীক্ষার জন্য? পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে, চল, তুই আর আমি ঘুরে আসি!"

"তুই যে বললি তুই পরশু দামাস্কাস যাবি?"

"তা হলে সেখানে যাব না। কেওনঝড় খুব চমৎকার জায়গা। রাজস্থানে তো! ওর পাশেই জয়সলমিরে আমার বড়-জামাইবাবু থাকেন। কোনও অসুবিধে নেই। বড়-জামাইবাবু গাড়ি দিয়ে দেবেন!"

"শোন্ জোজো, জয়সলমিরে তোর বড়-জামাইবাবু থাকতে পারেন, কিন্তু কেওনঝড় ওড়িশায়। কলকাতা থেকে খুব বেশি দূরে নয়।"

ঠিক আছে, সেইখানেই যাব।"

"তুই দামাস্কাস, লন্ডন ছেড়ে কেওনঝড়ে যেতে চাস?"

"ওসব জায়গায় যে-কোনও দিন যাওয়া যায়। বাবা কত নেমন্তন্ন পাচ্ছেন। প্লেনে উড়ে গেলেই হল। কেওনঝড়ে একলা-একলা গেলে বিপদে পড়ে যেতে পারিস, তোকে তো একটা প্রোটেকশান দেওয়া দরকার।"

সন্তু হেসে ফেলল। কোনও ব্যাপারেই জোজো দমে যাবার পাত্র নয়। সে

বলল, "কেওনঝড়ে কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই রে। ছোট নিরিবিলি জায়গা, কাকাবাবু বিশ্রাম নিতে গেছেন। দেখি, মাকে বলে দেখি, মা যেতে দিতে রাজি হন কি না !"

জোজোর বাস আগে এসে যেতে উঠে পড়ল সে। সন্তু দাঁড়িয়ে রইল লিন্ডসে স্ট্রিটের মোড়ের স্টপে। সন্ধেবেলা খুব এক-চোট বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তা এখন প্রায় ফাঁকা। এখনও বৃষ্টি পড়ছে গুঁড়িগুঁড়ি। বাস আসছে অনেকক্ষণ বাদে বাদে।

একটা সবুজ রঙের মারুতি গাড়ি থেমে গেল তার সামনে। গাড়িতে মোট তিনজন লোক। তাদের একজন মুখ বাড়িয়ে বলল, "আরে, তুমি সন্তু না ? এই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ, কোথায় যাবে ? এসো এসো, উঠে এসো, তোমায় পৌঁছে দেব !"

সন্তু লোকটিকে চেনে না, জীবনে কখনও দেখেইনি। বেশ শক্তসমর্থ চেহারা, হলুদ রঙের হাফশার্ট পরা, কলারটা ওলটানো। বছর চল্লিশেক বয়স হবে।

সন্তু বলল, "না, ঠিক আছে। আমি বাসেই যাব !"

লোকটি বলল, "তুমি রাজা রায়চৌধুরীর ভাইপো তো ? কালকেই সন্ধেবেলা ওঁর সঙ্গে দেখা হল নিউ আলিপুরে, সেখানে তোমার সম্পর্কেও কথা হচ্ছিল। এসো, উঠে এসো, বৃষ্টিতে ভিজবে কেন শুধু-শুধু ?"

সন্তু দু'দিকে মাথা নাড়ল।

লোকটি এবার বিদ্রূপের সুরে বলল, "তুমি গাড়িতে উঠতে ভয় পাচ্ছ নাকি ? আমি তো শুনেছিলাম তুমি খুব সাহসী ছেলে ! তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে চাইছি।"

একটা দোতলা বাস এসে গেছে। সেদিকে একবার দেখে নিয়ে সন্তু হাসিমুখে বলল, "আমি বৃষ্টির দিনে বাসে চাপতেই ভালবাসি !"

গাড়িটার পেছন দিক দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সে উঠে পড়ল বাসে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল দোতলায়।

ওই গাড়ির লোকটার চেহারা দেখলেই সুবিধের মনে হয় না। কাকাবাবু কাল সকালের ট্রেনে চলে গেছেন কেওনঝড়, আর সন্ধেবেলা ওর সঙ্গে দেখা হল নিউআলিপুরে ? লোকটার মতলব ভাল ছিল না। কাকাবাবুর শত্রুর সংখ্যা সত্যিই খুব বেড়ে গেছে দেখা যাচ্ছে।

কাকাবাবুরও খানিকটা দোষ আছে। অসম্ভব সব পাজি, শয়তান লোকগুলোকে তিনি নিজে খানিকটা শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেন, পুলিশে ধরিয়ে দেন না। সেই লোকগুলো কয়েকদিন পরেই সুস্থ হয়ে ফিরে আসে, তারপর তারা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে না ? বারুইপুরের অংশু চৌধুরীর মাথায় লাল পিঁপড়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল শুধু। লোকটাকে জেলে পাঠানো উচিত

ছিল। অংশু চৌধুরী নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক খেপে আছে।

এরা কি অংশু চৌধুরীর লোক, না অন্য কারও ? ঠিক বোঝা গেল না। কাকাবাবু যে কলকাতায় নেই, তা এরা জানে না।

বাস থেকে নামবার আগে সন্তু সাবধানে এদিক-ওদিক দেখে নিল। একটা পার্কের পাশ দিয়ে তাদের বাড়ির রাস্তায় যেতে হয়। রাত মোটে ন'টা, এর মধ্যেই পাড়াটা ফাঁকা হয়ে গেছে। পার্কটা একেবারে নির্জন। রাস্তার আলোগুলো নেভানো।

অন্যদিন সন্তু পার্কের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে। আজ আর সে ভেতরে ঢুকল না। বৃষ্টিতে পার্কের মাটি কাদা-কাদা হয়ে আছে। সে হাঁটতে লাগল রেলিং ধরে-ধরে।

হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে দুটো লোক এসে দাঁড়াল তার দু'পাশে। একজন তার কাঁধে হাত দিয়ে গম্ভীর কড়া গলায় বলল, "চ্যাঁচামেচি করে কোনও লাভ নেই, চুপচাপ গাড়িতে উঠে পড়ো।"

একটু দূরেই একটা গাড়ির পেছনের লাল আলো দেখা যাচ্ছে।

সন্তু বেশ বিরক্ত হল। পাড়ার মধ্যেও গুণ্ডামি ? এরা ভেবেছেটা কী, সন্তু কি এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ নাকি ? খুব কাছেই বিমানদার বাড়ি, দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। পাইলট বিমানদা বাড়িতে আছেন।

সন্তু স্প্রিংয়ের মতো লাফ দিয়ে পার্কের রেলিংটা ধরে সামারসল্ট খেয়ে চলে গেল পার্কের মধ্যে। তাকে ধরবার জন্য একটা লোক হাত বাড়াতেই সন্তু তার বগলের তলা চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল, লোকটাও উলটে চলে এসে পড়ল মাটিতে।

সন্তু চিৎকার করে বলল, "বিমানদা, বিমানদা, একবার চট করে আসুন তো ! শিগ্‌গির !"

অন্য লোকটা পার্কের মধ্যে চলে আসার চেষ্টা করছিল, তখনই থেমে থাকা গাড়িটা স্টার্ট দিল। দ্বিতীয় লোকটা একটু দ্বিধা করে, পার্কের মধ্যে আর না ঢুকে দৌড়ে গেল গাড়ির দিকে। সন্তু প্রথম লোকটার মুখ কাদার মধ্যে চেপে ধরে তার ঘাড়ের ওপর মারতে লাগল রদ্দা। লোকটা উঠতে পারল না।

কাছাকাছি কয়েকটা বাড়ির বারান্দায় লোক এসে গেছে। বিমানদা জানলা দিয়ে বলল, "কে ? কী হয়েছে ?"

গাড়িটাতে উঠে পড়ল অন্য লোকটা, সেটা হুশ্‌ করে বেরিয়ে গেল। সন্তু গাড়িটার নম্বর দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু নজর করতে পারল না।

মাটিতে পড়ে থাকা লোকটা একটা প্রচণ্ড ঝটকানি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল এবার। সঙ্গে-সঙ্গে সে কোমর থেকে একটা ছুরি বার করল। প্রায় আধ হাত লম্বা একটা ভোজালি। সন্তু এবার আর লোকটির সঙ্গে লড়তে গেল না, সে উঠে দৌড় মারল।

কাদায় পিছল হয়ে গেছে মাঠ, পা হড়কাতে হড়কাতে কোনও রকমে সামলে নিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটতে লাগল সন্তু। ভোজালি হাতে লোকটা তাকে তাড়া করে আসছে। সন্তু কোনও রকমে বিমানদার বাড়ির কাছে পৌঁছতে চায়। সে চিৎকার করছে, "বিমানদা ! বিমানদা !"

সন্তু আবার পার্কের রেলিং ডিঙিয়ে এসে পড়ল রাস্তায়। ভোজালি হাতে লোকটাও এসে রেলিংটা ধরতেই দেখতে পেল একসঙ্গে পাঁচ-ছ'জন লোককে। ভোজালি দেখে কয়েকজন একটু পিছিয়ে গেল। কাছেই একটা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, রাস্তার ওপর ইট জড়ো করা। বিমানদা একটা আস্ত ইট তুলে নিয়ে হুকুমের সুরে বলল, "ছুরি ফেলে দাও ! না হলে মাথা ভেঙে দেব !"

সন্তুও একটা ইট কুড়িয়ে নিয়েছে।

লোকটা কটমট করে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। ইটের সঙ্গে সে লড়তে পারবে না বুঝতে পেরে উলটো দিকে ফিরে দৌড় লাগাল। সবাই চেঁচিয়ে উঠল, ধর ধর, ধর ধর ! কিন্তু একটা সশস্ত্র লোককে ধরার জন্য কেউ অবশ্য পেছন পেছন ছুটে গেল না। লোকটা একবার আছাড় খেয়ে পড়ল, আবার উঠে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

বিমানদা জিজ্ঞেস করল, "লোকটা কে রে ? তোকে মারতে এসেছিল কেন ?"

সন্তু বলল, "আমি জীবনে ওকে দেখিনি। আর-একজন ছিল, আমার পাশে এসে বলল, একটা গাড়িতে উঠতে। ভেবেছিল, আমি ভয় পেয়ে অমনি সুড়সুড় করে উঠে পড়ব।"

বিমানদা বলল, "কাকাবাবু কলকাতায় নেই, এখন তুই বুঝি সর্দারি করে বেড়াচ্ছিস ?"

সন্তু বলল, "লোকটাকে আর-একটু হলে ঘায়েল করে দিতুম। ইস, পালিয়ে গেল ! ওকে ধরে রাখলে ওদের মতলবটা বোঝা যেত !"

বিমানদা বলল, "দেখে তো মনে হল ভাড়াটে গুণ্ডা ! কেউ পাঠিয়েছিল তোকে ধরে নিয়ে যেতে।"

সন্তু বলল, "পুলিশে ধরিয়ে দিলে তারা ঠিক ওর কাছ থেকে কথা বার করে নিতে পারত !"

বিমানদা বলল, "সাবধানে ঘোরাফেরা করিস সন্তু। এখন কাকাবাবু নেই...চল, তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব ?"

সন্তু হেসে বলল, "আমাকে এ-পাড়া থেকে ধরে নিয়ে যাবে এমন সাধ্য কারও নেই। এরা তো একেবারে নভিস গুণ্ডা ! সঙ্গে রিভলভার পর্যন্ত আনেনি !"

বাড়ির সদর দরজার কাছে পৌঁছে সন্তু ভাবল, লোক দুটোকে বাধা না দিয়ে ওই গাড়িটায় উঠে পড়লে বোধহয় মন্দ হত না। দেখা যেত, ওরা কী করে।

অন্তত ওদের পরিচয়টা তো জানা যেত !

ওরা নিশ্চয়ই হাল ছেড়ে দেবে না, আবার ফিরে আসবে !

৭

রাত সাড়ে এগারোটার সময় কাকাবাবু বললেন, "তা হলে দেবলীনা, এবারে সেই এক্সপেরিমেন্টটা করা যাক ?"

দেবলীনা ঘাড় হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ !"

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে ছিল ওরা দু'জন। আজ ঝড়-বৃষ্টি নেই, আকাশ পরিষ্কার। সন্ধে থেকে কিছুই ঘটেনি। আজ আর কোনও ঘর থেকে কোনও রহস্যময় ব্যক্তি বেরিয়ে এল না, কোনও বিকট শব্দ কিংবা অদ্ভুত গন্ধ পাওয়া গেল না, কোনও ঘটনাই ঘটল না। সব চুপচাপ।

ওরা দু'জনে বই পড়লেন অনেকক্ষণ ধরে, কাকাবাবু মাঝে-মাঝেই চোখ তুলে দেখছিলেন দক্ষিণের কোণের ঘরটার দিকে। এর মধ্যে শশাবাবু এসে খাবারদাবার দিয়ে গেছে, তারপর এঁটো বাসনপত্র নিয়ে যাবার সময় বলেছে, "এবার আমি ঘুমোতে চললাম, আর কিছু দরকার নেই তো ?" কাকাবাবু তাকে কফির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, সে কফিও দিয়ে গেল। এখন নীচে আর কোনও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই।

অন্য একটা ঘর থেকে আজ একটা মস্ত বড় ইজিচেয়ার বার করা হয়েছে। সেটা এতই পেল্লায় যে, দেখলে ঠাকুর্দা-চেয়ার বলতে ইচ্ছে করে। বসবার জায়গাটা খানিকটা ছিঁড়ে গেছে বটে, কিন্তু তার ওপরে একটা তোয়ালে চাপা দিয়ে কাজ চালানো যায়।

কাকাবাবু নিজে সেই চেয়ারটায় বসে ছিলেন এতক্ষণ, এবারে দেবলীনাকে সেখানে বসালেন। পেট্রোম্যাক্সটা খুব কমিয়ে রেখে দিলেন সেই চেয়ারের পেছন দিকে। সামনের বারান্দাটা আবছা অন্ধকার হয়ে গেল।

কাকাবাবু ঘরে গিয়ে একটা কালো রঙের ড্রেসিংগাউন পরে এলেন। হাতে একটা বড় টর্চ। দেবলীনার সামনে দাঁড়িয়ে সেই টর্চটা জ্বেলে আলো ফেললেন দেবলীনার চোখে। দেবলীনা চোখ পিটপিট করতে লাগল। কাকাবাবু বললেন, "একটুক্ষণ জোর করে চেয়ে থাক। চোখ বন্ধ করিস না।"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে টর্চটা এগিয়ে আনতে লাগলেন দেবলীনার মুখের কাছে। তাঁর ডান হাতের তর্জনীটা রইল টর্চের গায়ে লাগানো। একেবারে কপালের কাছে টর্চটা এসে পড়লে দেবলীনা বলল, "আমি আর তাকাতে পারছি না, কাকাবাবু !"

কাকাবাবু তাঁর তর্জনী দিয়ে আলতো করে ছুঁয়ে দিলেন দেবলীনার দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানের জায়গাটা !

দেবলীনা বলল, "কাকাবাবু, আমার কপালের ভেতরটা ঝনঝন করে উঠল। এটা কি ম্যাজিক ?"

কাকাবাবু কোনও কথা না বলে টর্চটা দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার ঠিক একইভাবে তর্জনী এগিয়ে আনলেন, আবার ছুঁয়ে দিলেন কপালের সেই একই জায়গা।

পাঁচবার এরকম করার পর দেবলীনা আর চোখ মেলতে পারল না।

কাকাবাবু এবারে খুব টেনে-টেনে সুর করে বলতে লাগলেন, "ঘুম-ঘুম-ঘুম-ঘুম-ঘুম-ঘুম..."

দেবলীনার চোখের পাতা দুটি বন্ধ, কিন্তু কাঁপছে, যেন সে চেষ্টা করেও খুলতে পারছে না চোখ। তার মুখে একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব।

কাকাবাবু তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ?"

"আমি দেবলীনা দত্ত। আমার বাবার নাম শৈবালকুমার দত্ত, আমরা প্রিন্স আনোয়ার শা রোডে থাকি..."

"তোমার কি কিছু কষ্ট হচ্ছে, দেবলীনা ?'

"না। একটুও কষ্ট হচ্ছে না। আমার ভাল লাগছে।"

"তুমি এখন কোথায় ?"

"আমি কেওনঝড়ে বেড়াতে এসেছি।"

"তুমি তোমার বাবার সঙ্গে বেড়াতে এসেছ, তাই না ? সঙ্গে তোমার বান্ধবী শর্মিলা রয়েছে ?"

"হ্যাঁ। বাবার সঙ্গে, শর্মিলা..."

"তোমরা জঙ্গলে বেড়াতে গেলে, কার সঙ্গে গেলে ?"

"মনোজবাবুর সঙ্গে। জঙ্গলে কত পাখি, টিয়া, বুলবুলি, ঘুঘু..."

"রাত্তিরবেলা তুমি হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলে, একা-একা ঘর থেকে বেরিয়ে এলে।"

"না তো, একা-একা বেরিয়ে আসিনি, একজন আমায় ডাকল।"

"কে তোমায় ডাকল, দেবলীনা ?"

"একজন বুড়ো লোক, তার সাদা চুল, সাদা দাড়ি, সন্ন্যাসীর মতন দেখতে। সে আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। সে বলল, "চম্পা, এসো, এসো এসো..."

"কিন্তু তুমি তো দেবলীনা, তুমি তো চম্পা নও !"

"হ্যাঁ, আমি দেবলীনা, দেবলীনা। আমি চম্পা নই !"

"তবে সে তোমায় চম্পা বলল কেন ?"

"সে বলল, চম্পা, এসো, এসো, এসো..."

"তুমি তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ? সে তোমাকে কোথায় নিয়ে গেল ?"

"সে চলে গেল। তারপর আমি...তারপর আমি...তারপর আমি..."

হঠাৎ চোখ খুলে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল দেবলীনা। কপালের ওপর থেকে কাকাবাবুর হাতখানা এক ঝটকায় সরিয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল, দেবলীনা, ঘুম ভেঙে গেল ?"

দেবলীনা কটমট করে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কে ? কেন এখানে এসেছ ? আমি রাজকন্যা চম্পা, আমাকে বিরক্ত কোরো না..."

কাকাবাবু আর কিছু বলবার আগেই দেবলীনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি আসছি···আমি আসছি···"

তারপর কাকাবাবুকে সে এক ঠেলা দিল। তার গায়ে এখন এত জোর যে, কাকাবাবু তার হাতটা ধরবার চেষ্টা করেও পারলেন না। তিনি বারান্দার রেলিং ধরে ব্যালান্স সামলালেন।

দেবলীনা দৌড়ে বারান্দার খানিকটা পেরিয়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

কাকাবাবু বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর এক্সপেরিমেন্টের যে এরকম ফল হবে, তা তিনি কল্পনাই করতে পারেননি। আগে তিনি যে-কয়েকজনের ওপর হিপনোটিজম্ পরীক্ষা করেছেন, কখনও তো এমন কিছু ঘটেনি।"

এই সময় তিনি সন্তুর অভাবটা খুব অনুভব করলেন। দেবলীনা দৌড়ে চলে গেল। তাঁর দৌড়বার ক্ষমতা নেই। ক্রাচ বগলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই দেবলীনা অনেক দূর চলে যাবে। সন্তু থাকলে ছুটে গিয়ে দেবলীনাকে আটকাতে পারত। সন্তুকে সঙ্গে না নিয়ে আসাটা খুব ভুল হয়েছে।

দেবলীনার যদি এখন কোনও বিপদ হয়, তা হলে তিনিই দায়ী হবেন।

তক্ষুনি দেবলীনাকে অনুসরণ করার চেষ্টা না করে তিনি বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন।

দেবলীনা সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের বারান্দা পেরিয়ে উঠোনে নেমে পড়েছে। কাকাবাবু ব্যাকুলভাবে ডাকলেন, "দেবলীনা ! দেবলীনা !"

দেবলীনা শুনতে পেল না, কিংবা শুনেও গ্রাহ্য করল না। উঠোন দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে সে বড় গেটটার তলায় ছোট গেটটা খুলে ফেলল। তারপর বাইরে বেরিয়ে গেল।

দুর্যোধন বা শশাবাবুকে ডেকে কোনও লাভ নেই। ওরা জাগবে না। জোর করে জাগালেও ওদের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাবে না। রিভলভারটা পকেটে নিয়ে, টর্চ জ্বেলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন সাবধানে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তিনি যদি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যান, তা হলে কোনওই কাজ হবে না। একটা পা খোঁড়া বলেই তিনি অন্য পা-টা সম্পর্কে এখন বেশি সাবধান। তিনি ভাবতে লাগলেন, দেবলীনাকে নিয়ে এরকম পরীক্ষা করার ঝুঁকি নেওয়াটা তাঁর ঠিক হয়নি। দেবলীনা কেন বলল, আমি

চম্পা ! আগেই কেউ এই কথাটা ওর মনে গেঁথে দিয়েছে !

গেট পেরিয়ে বাইরে এসে কাকাবাবু এদিক-ওদিক তাকালেন। চতুর্দিকে একেবারে শুনশান। আজ শেয়ালরাও ডাকেনি। তবে চতুর্দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়, খানিকটা জ্যোৎস্না ফুটেছে আকাশে।

সামনের জঙ্গলের মধ্যে বালিমাটির টিলাটা তিনি দুপুরে এক সময় দেখে এসেছেন। দেবলীনা যদি সেখানে যায়, তা হলে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না।

কাকাবাবু টর্চ জ্বেলে চারদিক দেখে নিলেন ভাল করে। মানুষজনের কোনও চিহ্ন নেই, তবু তাঁর মনে হল, দু'একজন বোধহয় লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে দেখছে আনাচ-কানাচ থেকে। কেন তাঁর এরকম মনে হচ্ছে ? কেউ হঠাৎ পেছন থেকে তাঁকে আক্রমণ করবে ?

এই চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে এগোতে লাগলেন দৃঢ় পায়ে। দেবলীনার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন তিনি, দেবলীনার কোনও রকম বিপদ-আপদ হলে শৈবাল দত্তের কাছে তিনি মুখ দেখাবেন কী করে ?

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই তিনি শুনতে পেলেন একটা গানের সুর। দেবলীনার গলা। দেবলীনা গান গাইছে। শৈবাল বলেছিলেন যে, দেবলীনাকে তিনি আগে কোনওদিন গান গাইতে শোনেননি। কাকাবাবুও শোনেননি।

সেই গানের আওয়াজ লক্ষ্য করে এগোতে লাগলেন কাকাবাবু। জঙ্গলের শুকনো পাতায় তাঁর ক্রাচ ফেলার শব্দ হচ্ছে। আরও একটা ওই রকম শব্দ যেন কানে আসছে। কেউ কি তাঁকে অনুসরণ করছে ? এক-একবার থেমে তিনি অন্য শব্দটা বোঝার চেষ্টা করলেন। কিন্তু থামলে আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। তবে কি তাঁর মনের ভুল ? টর্চের আলোতেও দেখা যাচ্ছে না কিছুই।

জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় বালিয়াড়িটা এক সময় তিনি দেখতে পেলেন। মস্ত বড় একটা উই-ঢিপির মতন। সেটা দেখেই তাঁর মনে হল, এক সময় কেউ বালি-পাথর ফেলে-ফেলে এটাকে বানিয়েছিল। হয়তো শিকার করার সময় ওর ওপর শিকারিরা বসত । এখন সেটার গায়ে অনেক আগাছা জন্মে গেছে।

টিলাটার চূড়ার প্রায় কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে দেবলীনা। মাথাটা ঝুঁকে গেছে সামনের দিকে। ঠিক যেন পুজো করার ভঙ্গি। সে যে গানটা গাইছে, তার কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। একটানা সুর, তার মধ্যে যেন মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে, 'ওমা, ওমা, মা গো মা...'

শৈবাল দত্ত বলেছিলেন যে, ঠিক এই সময় ঝড় উঠেছিল, কিন্তু আজ ঝড় নেই। শৈবাল দত্ত আরও বলেছিলেন যে, তিনি দেবলীনার গায়ে হাত দিতে যেতেই সে ছুটে পালিয়েছিল। কাকাবাবু ভাবতে লাগলেন, কী করা যায়। আজও যদি দেবলীনা দৌড়ে পালায়, আর বাড়ি না-ফিরে চলে যায় আরও

দূরে ?

দেবলীনার নাম ধরে ডাকলে কি কোনও লাভ হবে ? বরং তিনি ভাবলেন, দেখাই যাক না এর পর কী হয় । এখন দেবলীনার বিপদে পড়ার সম্ভাবনা নেই, তিনি পাহারা দিচ্ছেন । তাঁর বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল ।

দেবলীনার গান শুনতে শুনতে একদৃষ্টিতে সে-দিকে তাকিয়ে ছিলেন কাকাবাবু, হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে তিনি চমকে উঠলেন ।

টিলাটার গা ফুঁড়ে যেন উঠে এল একজন মানুষ । জ্যোৎস্নায় দেখা গেল তার মাথার চুল আর মুখের লম্বা দাড়ি ধপধপে সাদা । পরনে রক্তাম্বর । এক-পা এক-পা করে সে এগিয়ে আসতে লাগল কাকাবাবুর দিকে ।

এই সেই কাল রাতে দেখা বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ! কাকাবাবু আজ আর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন না । ভূত নয়, মানুষ ! আজ এর সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে ।

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, "নমস্কার !"

বৃদ্ধটি কাকাবাবুর একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন । হাত বাড়ালেই তাঁকে ছোঁয়া যাবে । এমনকী তাঁর লাল রঙের চাদর উড়ে এসে লাগল কাকাবাবুর গায়ে ।

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে ?"

বৃদ্ধটি ডান হাত তুলে গম্ভীর গলায় বললেন, "তুই যা ! তোর এখানে থাকার দরকার নেই ! তুই যা, তুই যা !"

কাকাবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, "আমি চলে যাব ? কেন ? আপনি কে, আগে বলুন !"

বৃদ্ধটি কাকাবাবুর মুখের সামনে হাতখানা দোলাতে-দোলাতে বলতে লাগলেন, "তুই যা ! তুই যা ! তুই যা ! চলে যা !"

কাকাবাবুর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল । এ কী ! এই বৃদ্ধ তাকে হিপনোটাইজ করছে নাকি ? এ যে খোদার ওপর খোদকারি ! তিনি নিজে পয়সা খরচ করে অস্ট্রিয়া গিয়ে এই বিদ্যে শিখেছেন, আর তাঁর ওপরেই কেরদানি দেখাতে এসেছে একটা গ্রাম্য বুড়ো ?

কাকাবাবু হেসে বলতে গেলেন, আমার ওপর ওসব চালাকি চলবে না । আপনি কে, কী চান, আগে বলুন...

কিন্তু এই কথা বলতে-বলতে কাকাবাবুর জিভ জড়িয়ে গেল, চোখ টেনে এল । মাথা ঘুরছে । তিনি নিজেকে ঠিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন । তবু চোখটা বন্ধ হয়ে আসছে । তিনি পকেট থেকে রিভলভারটা বার করার কথা ভাবলেন, কিন্তু তাঁর হাত অবশ হয়ে গেছে । তিনি শুধু শুনতে পাচ্ছেন বৃদ্ধের গমগমে গলা, "তুই যা···তুই যা···চলে যা···চলে যা !"

সেই আওয়াজে যেন তাঁর কানে তালা লেগে গেল, তিনি সম্পূর্ণ চেতনা হারিয়ে ফেললেন । কিন্তু মাটিতে পড়ে গেলেন না । বৃদ্ধ তাঁর কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে

দিতেই তিনি কাঠের পুতুলের মতন ঘুরে গেলেন উলটো দিকে। হাঁটতে আরম্ভ করলেন অন্ধের মতন। তাঁর বগল থেকে ক্রাচ দুটো খসে পড়ে গেল। তবু তিনি হাঁটতে লাগলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

কয়েকটা গাছে ধাক্কা খেতে-খেতে এক সময় তিনি পড়ে গেলেন ঝপাস করে। তাঁর শরীর নিস্পন্দ হয়ে গেল।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন হাত তুলে। এবারে তিনি পেছন ফিরে ডাকলেন, "চম্পা, চম্পা !"

দেবলীনা সঙ্গে-সঙ্গে গান থামিয়ে বলল, "কী গুরুদেব ?"

বৃদ্ধ আদেশ করলেন, "এসো, আমার কাছে চলে এসো !"

চম্পা টিলার ওপর থেকে নেমে এসে বৃদ্ধের কাছে বসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

জঙ্গল থেকে আর-একটি লোক এবার বেরিয়ে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধের পাশে। বৃদ্ধ তাকে দেখে বললেন, "মনোজ, চম্পাকে কোলে তুলে নাও। তারপর চলো..."

সে লোকটি বলল, "গুরুদেব, ওই খোঁড়া লোকটি কি জঙ্গলে পড়ে থাকবে ?"

"ও এখন থাক। ওর কোনও ক্ষতি হবে না। পরে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসো। এখন চম্পাকে ভেতরে নিয়ে চলো..."

মনোজ নিচু হয়ে দেবলীনার হাত ধরতে যেতেই দেবলীনা ছটফট করে উঠে বলল, "না, আমি চম্পা নই। আমি দেবলীনা ! আমার কাকাবাবু কোথায় ?"

বৃদ্ধ বললেন, "তোমার কাকাবাবু কেউ নেই। তুমি চম্পা, তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি এখন আমাদের সঙ্গে এক জায়গায় যাবে !"

দেবলীনা চেঁচিয়ে উঠল, "না, আমি দেবলীনা। আমি দেবলীনা !"

চেঁচাতে চেঁচাতে সে এক ছুট লাগাল। নেমে গেল জঙ্গলের দিকে।

মনোজ বলল, "গুরুদেব, ওর ঘোর কেটে গেছে। ও জেগে উঠেছে। এখন কী হবে ?"

বৃদ্ধ ধমক দিয়ে বললেন, "মূর্খ, ওকে ধরো। আমার চোখের সামনে নিয়ে এসো। আমি ওকে আবার মন্ত্র দিয়ে দিচ্ছি। শিগগির যাও !"

মনোজ ছুটল দেবলীনার পেছনে-পেছনে। তারপর চলল একটা লুকোচুরি খেলা। মনোজের বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নয়। এক-একটা বড়-বড় গাছ ঘুরে-ঘুরে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল দেবলীনা। কাকাবাবু কাছেই অচেতন হয়ে পড়ে আছেন, তিনি কিছু টেরও পেলেন না !

হঠাৎ দেবলীনা তরতর করে চড়তে লাগল একটা গাছে। মনোজ ছুটে এসে তার একটা পা চেপে ধরলেও দেবলীনা অন্য পা দিয়ে একটা জোর লাথি মারল

তার মাথায়। তারপর উঠে গেল গাছের ওপরে। একেবারে মগডালে গিয়ে বসল।

দেবলীনার পায়ের একটা আঙুল লেগে গেছে মনোজের বাঁ চোখে। সে চোখ চেপে ধরে যন্ত্রণায় কাতর গলায় বলল, "গুরুদেব, মেয়েটা গাছে উঠে গেছে। এখন কী করব?"

দূর থেকে গুরুদেব বললেন, "ওকে গাছ থেকে নামিয়ে আনো!"

মনোজ বলল, "কী করে নামাব? আমি গাছে চড়তে গেলে ও আমায় লাথি মারবে! অতি দস্যি মেয়ে! কুড়ল এনে গাছটা কেটে ফেলব?"

ওপর থেকে দেবলীনা বলল, "ছিঃ মনোজবাবু! আগেরবার আপনি আমার সঙ্গে কত ভাল ব্যবহার করেছিলেন!"

এবার গুরুদেব চলে এলেন গাছটার কাছে। মনোজকে ভর্ৎসনা করে তিনি বললেন, "ছিঃ, চম্পার সঙ্গে ওরকমভাবে কথা বলতে নেই। সোনার মেয়ে চম্পা, গাছ কেটে ফেললে ওর চোট লাগবে না! ও এমনিই নেমে আসবে!"

ওপরের দিকে তাকিয়ে তিনি দু'হাত তুলে মিষ্টি করে বললেন, "এসো, চম্পা, নেমে এসো, এসো..."

দেবলীনা বলল, "আমি চম্পা নই। কে চম্পা? সে তো মরে গেছে অনেকদিন আগে। আমি দেবলীনা!"

গুরুদেব এক সুরে আবার বললেন, "এসো, চম্পা, নেমে এসো, এসো, এসো, এসো, এসো..."

দেবলীনা আবার বলল, "আমি, আমি, আমি, আমি, হ্যাঁ, আমি চম্পা। গুরুদেব আমি আসছি..."

তার চোখ বুজে এল, হাতের মুঠি আলগা হয়ে গেল। ওপরের ডাল ছেড়ে সে পড়ে গেল নীচের ডালে, তারপর মাটিতে পড়ে যাবার আগেই তাকে লুফে নিলেন গুরুদেব। অত বৃদ্ধ হলেও তাঁর শরীরে প্রচুর শক্তি।

তিনি স্নেহের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "চম্পা, তোমার লাগেনি তো?"

দেবলীনা আচ্ছন্ন গলায় বলল, "না, আমার একটুও লাগেনি!"

গুরুদেব বললেন, "ঘুমিয়ে পড়ো, চম্পা। ঘুমোও, চম্পা, ঘুমোও, ঘুমোও, ঘুমোও..."

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল দেবলীনা। গুরুদেব এবার তাকে দিয়ে দিলেন মনোজের হাতে। মনোজ তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলল।

হাঁটতে হাঁটতে মনোজ জিজ্ঞেস করল, "গুরুদেব, মেয়েটা হঠাৎ জেগে উঠল কী করে? এই একটু আগে ও ঠিক চম্পার মতন সুরে গান গাইছিল। আমি ভাবলুম, ও সত্যি চম্পা হয়ে গেছে।"

গুরুদেব বললেন, "মানুষের মন যে কী বিচিত্র, তা বোঝা দায়! সব কিছু তো আমিও বুঝতে পারি না। এক-এক দিন ঘুম ভেঙে এই দুনিয়াটা সম্পূর্ণ

অচেনা মনে হয় না ? নিজেরই ঘরে শুয়ে আছ, অথচ চোখ মেলে তুমি মনে করতে পারবে না তোমার ঘরের দরজাটা কোন্ দিকে। হয় না এরকম ? সে-সব দিনে মনটা অন্য কোনও জগতে ভ্রমণ করে আসে ! বুঝলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি !"

"ছাই বুঝেছ ! এসব কথা বুঝলে আর সবসময় ছটফট করতে না। এই মেয়েটির মন বড় পবিত্র, কোনও দাগ পড়েনি। এরকম মেয়ের মনের জোর অনেক তাগড়া জোয়ানের চেয়েও বেশি। আরও একটা কথা শুনে রাখো, একই মানুষের মনের জোর সব দিন সমান থাকে না। কম-বেশি হয়। আমারই তো এরকম হয়। যেমন ধরো, গতকালই আমি তেমন জোর পাইনি। না হলে কালই আমার চম্পা-মাকে নিয়ে যাওয়ার বাসনা ছিল। কিন্তু কাল আমি ওর কাকাটিকে দেখে একটু যেন ভয় পেয়ে গেলাম !"

"আপনি ভয় পেলেন ? বলেন কী ?"

"সত্য কথা স্বীকার করতে লজ্জা কিসের ? কাল ওর কাকাটির দিকে এক নজর চেয়েই আমার মনে হল, এই মানুষটিরও যথেষ্ট পরাক্রম আছে। আমাকে দেখে সে ভয় পায়নি। তাকে কি কাবু করতে পারব ? ব্যস, একবার যে-ই ওরকম সন্দেহ হল, অমনি আমার শক্তি কমে গেল।"

"কিন্তু আজ তো ওর কাকা আপনার সামনে দাঁড়াতেই পারল না ?"

"ওর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝলাম, ও আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। সামান্য এক বৃদ্ধ ভেবেছে। ওর নিজের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না।"

"আমি অবশ্য পেছন দিকে তৈরি ছিলাম। ও যদি তেড়িবেড়ি করত, আমি আঘাত করতুম ওর মাথায়।"

"ওহে মনোজ, আমি যখন সঠিক তেজে থাকি, তখন আমার চোখের সামনে পঞ্চাশ মুহূর্তের বেশি সজ্ঞানে থাকতে পারে, এমন মানুষ ভূ-ভারতে নেই। বৃথা কি এত বছর সাধনা করেছি ?"

কথা বলতে বলতে ওরা ঝোপের সামনে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধটি দু'হাতে ঝোপটা ফাঁক করতেই দেখা গেল একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ। মনোজ আগে দেবলীনাকে নিয়ে ঢুকে গেল তার মধ্যে, পরে ঢুকলেন গুরুদেব।

গুহার মধ্যে কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন অন্ধকার নয়। দূরে একটা মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। গুহাটি বেশি চওড়া নয়। দেবলীনার যাতে মাথায় গুঁতো না লাগে, সেজন্য অতি সাবধানে হাঁটতে লাগল মনোজ। পেছন থেকে গুরুদেব বলতে লাগলেন, "আস্তে, আস্তে..."

যেখানে মশাল জ্বলছে, সেখানটা একটা ঘরের মতন। মশালটা একটা দেওয়ালে গোঁজা। মেঝেতে পাতা একটা বাঘছালের আসন, সামনে পোঁতা একটা ত্রিশূল। অনেক শুকনো ফুল-পাতা সেখানে ছড়ানো। এক পাশে একটা

বিছানা পাতা, সেখানে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে কে যেন শুয়ে আছে।

মনোজ দেবলীনাকে শুইয়ে দিল বিছানার পাশে।

বাঘছালটির সঙ্গে বাঘের মুণ্ডুটি পর্যন্ত এখনও রয়েছে। বৃদ্ধটি এসে বসলেন সেই আসনে। একটা কমণ্ডলু থেকে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, "আঃ!"

তারপর কমণ্ডলুটা নামিয়ে রেখে দুটো হাত ওপরের দিকে তুলে আবেগের সঙ্গে বললেন, "মা চম্পা, মা চম্পা, এবার তুই মুক্তি পাবি! এতদিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। মনোজ, সব উপকরণ জোগাড় করো!"

মনোজ বলল, "সবই নিয়ে আসব প্রভু। আপনি কাজ শুরু করুন।"

মনোজ পাশের বিছানা থেকে চাদরটা তুলে নিতেই দেখা গেল, সেখানে শোওয়ানো রয়েছে একটি কঙ্কাল! তার গায়ে একটা নতুন লালপাড় শাড়ি জড়ানো!

৮

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, কে যেন তাঁকে ডাকছে। কেউ তাঁর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলছে তবু তাঁর চোখ খুলতে ইচ্ছে করছে না। আরও ঘুম পাচ্ছে। ঘুম কী আরামের!

তারপর তিনি সন্তুর গলার আওয়াজ চিনতে পারলেন। একবার চোখ মেললেন অতিকষ্টে। হ্যাঁ, সন্তুই তো দাঁড়িয়ে আছে তাঁর বিছানার কাছে। কাকাবাবু ভাবলেন, এটা তাঁদের কলকাতার বাড়ি, তাঁর নিজের বিছানা। এখন অনেক রাত, শুধু-শুধু সন্তু এই সময় তাঁর ঘুম ভাঙাল কেন? তবে বোধহয় সন্তু তাঁর জন্য কফি এনেছে।

তিনি ঘুম-চোখেই একটা হাত বাড়িয়ে বললেন, "দে, কফিটা দে!"

সন্তু মুখটা ঝুঁকিয়ে এনে ব্যাকুলভাবে বলল, "কাকাবাবু, তোমার কী হয়েছে? শরীর খারাপ?"

কাকাবাবু কপাল কুঁচকে বললেন, "নাঃ, আমার কেন শরীর খারাপ হবে? তুই তো আমায় ডেকে তুললি। তোর কী হয়েছে?"

"কাকাবাবু, দেবলীনা কোথায়?"

"দেবলীনা? কে দেবলীনা? ও হ্যাঁ? শৈবাল দত্তের মেয়ে। সে এখানে কী করে আসবে? কেন, সে নিজের বাড়িতে নেই?"

"কাকাবাবু, ভাল করে তাকাও। দেবলীনা তোমার সঙ্গে এখানে এসেছিল! সে কোথায়? তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!"

এবারে কাকাবাবু ভাল করে চোখ মেলে ঘরের ছাদ ও দেওয়াল দেখে বেশ অবাক হয়ে বললেন, "আরে, কোথায় শুয়ে আছি আমি? এটা কোন্ বাড়ি?"

সন্তু বলল, "এটা কেওনঝড়ের সেই রাজবাড়ি। তোমার কী হয়েছে, তোমাকে কেউ ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে?"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "ঘুমের ওষুধ? না তো? এটা কেওনঝড়ের সেই রাজবাড়ি? তা হলে তুই কী করে এখানে এলি?"

"আমি আর জোজো সকালের বাসে এখানে চলে এলুম। বাসটা লেট করেছিল, পৌঁছল বিকেলবেলায়। এখানে আসতে আসতে সন্ধে। তখন থেকে দেখছি তুমি ঘুমোচ্ছ। কিছুতেই জাগানো যাচ্ছে না। দেবলীনাকেও দেখতে পাচ্ছি না!"

"রাত্তির হয়ে গেছে...আজ ক'তারিখ?"

"আজ ন' তারিখ। তোমরা এখানে এসেছ তিনদিন আগে!"

"তিনদিন? না দু' দিন?"

"তিনদিন! তোমাকে আমি একটা খুব জরুরি খবর দিতে এসেছি!"

"তিনদিন, তুই কী বলছিস রে, সন্তু! কিছুই তো বুঝতে পারছি না। তা হলে মাঝখানে একটা দিন কোথায় গেল?"

"নীচে একটা লোক বলল, তুমি সারাদিন ধরে ঘুমোচ্ছ! তোমাকে খাবার দেবার জন্য ডাকতে এসেছিল, তুমি তাও জাগোনি!"

"সারাদিন ঘুমিয়েছি? যাঃ! আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না!"

"আমরা প্রথমে ডাকাডাকি করে কারও সাড়াশব্দ পাইনি। তারপর বাড়ির পেছন দিকের একটা ভাঙা জায়গা দিয়ে ঢুকে পড়লুম। একতলায় একটি ঘরে দেখি একজন লোক ঘুমোচ্ছে। তার নাম শশধর দাস। সে কোনও কথারই জবাব দিতে পারে না!"

"শশধর দাস। মানে, শশাবাবু! হ্যাঁ, হ্যাঁ, শশাবাবু। মাথাজোড়া টাক তো! সন্তু, ওকে বল না আমাকে এক কাপ কফি বানিয়ে দিতে!"

সন্তু চেঁচিয়ে ডাকল, "জোজো, এই জোজো, শোন!"

জোজো একটা টর্চ নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সন্তুর ডাক শুনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "একেবারে সিনেমার ভুতুড়ে বাড়ি রে, সন্তু! কতগুলো ঘর! সব ফাঁকা! কাকাবাবু জেগেছেন?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, তুই একটা কাজ কর তো!"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আমরা আবার সেই মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলের টিম! এবারে ওড়িশার জঙ্গলে অভিযান! এবারে হাতির পিঠে চড়ব।...কই রে সন্তু, কাকাবাবু যে এখনও ঘুমিয়ে আছেন দেখছি!"

সত্যিই, কাকাবাবুর মাথাটা আবার ঘুমে ঢুলে পড়ছে। চক্ষু বোজা!

সন্তু বলল, "এইমাত্র যে জেগে কথা বললেন!"

জোজো বলল, "সেটসি মাছি কামড়েছে। আমি আফ্রিকায় দেখেছি, সেটসি

মাছির কামড় খেয়ে অনেকের এইরকম ঘুম-রোগ হয়। ভেরি ডেঞ্জারাস!"

সন্তু বলল, "যাঃ, আফ্রিকার সেটসি মাছি এখানে আসবে কী করে?"

"এখানকার জঙ্গলে থাকতে পারে। কিংবা কেউ আফ্রিকা থেকে নিয়ে এসে কাকাবাবুর গায়ে ছেড়ে দিয়েছে। একটা ঘরে কতবড় একটা মাকড়সা দেখলুম জানিস? এই আমার হাতের সমান!"

"তুই এক কাজ কর তো, জোজো! নীচে যে লোকটা আছে, তাকে গিয়ে বল, খুব কড়া করে এক কাপ কফি বানিয়ে দিতে। দুধ-চিনি বাদ!"

"আমি একলা-একলা যাব? সিঁড়িটা বড্ড অন্ধকার!"

"এই জোজো, তোর এরকম করলে চলবে না বলে দিচ্ছি। আমি তোর সঙ্গে গেলে কাকাবাবুর কাছে কে থাকবে? টর্চটা নিয়ে যা!"

জোজো চলে যাবার পর সন্তু তখন আর কাকাবাবুকে জাগাবার চেষ্টা করল না। তার সারা মুখে দুশ্চিন্তা। দেবলীনা কোথায় গেল? নীচের লোকটা বলেছে যে, সেও সারাদিন দেবলীনাকে দ্যাখেনি। তবে কে একজন মনোজবাবু নাকি বলেছে যে, দেবলীনা নিজে-নিজে কলকাতায় ফিরে গেছে। তা কখনও হয়! দেবলীনা কাকাবাবুকে এই রকম অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যাবে?"

সন্তু বাইরে বারান্দায় এসে দেখল, একটা চেয়ারের ওপর দেবলীনার একখানা বই খোলা অবস্থায় ওলটানো। ঠিক যেন সে বইটা পড়তে-পড়তে উঠে গেছে। সেই চেয়ারের কাছে পড়ে আছে দেবলীনার চটি। ঘরের মধ্যে সে দেবলীনার স্যুটকেস, জামাকাপড়ও দেখতে পেয়েছে। দেবলীনা একটু পাগলি-পাগলি আছে ঠিকই, একদিন সন্তুদের বাড়ি থেকে রাগ করে চটি ফেলে রেখেই খালি পায়ে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখান থেকেও সে ওইভাবে চলে যেতে পারে?

জোজো কফি নিয়ে আসবার পর সন্তু কাকাবাবুর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল কয়েকবার।

কাকাবাবু একটুখানি চোখ মেলে বললেন, "অ্যাঁ? কী হয়েছে?"

"কাকাবাবু, তোমার কফি!"

"কফি? ও, আচ্ছা!"

এবারে ভাল করে উঠে বসে কাকাবাবু খুব গরম ধোঁয়া-ওঠা কফি তিন-চার চুমুকে খেয়ে ফেললেন। তারপর আপন মনে বললেন, "তিনদিন? মাঝখানের একটা দিন কোথায় গেল?"

জোজো বলল, "আমিই শশধরবাবুকে রাত্তিরের খাবার অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। বলল, ভাত আর ডিমের ঝোল ছাড়া কিছু হবে না। লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল, আমরা কবে যাব! আরে, এই তো সবে এলুম!"

সন্তু বলল, "ওই লোকটার কথা পরে হবে। তার আগে দেবলীনাকে খুঁজে বার করা দরকার। কাকাবাবুর যে কিছুতেই ঘুম ছাড়ছে না!"

কাকাবাবু নিজের চুল মুঠি করে চেপে ধরে বললেন, "আমার যে কিছুই মনে পড়ছে না রে সন্তু ! কী হল বল তো !"

তারপর নিজের কালো ড্রেসিং গাউনটা একটু তুলে বললেন, এটাতে জল-কাদা মাখা ! এই নোংরা পোশাকটা না খুলেই আমি শুয়ে পড়েছিলুম ? কতক্ষণ ঘুমিয়েছি ? আমার এখনও ঘুম পাচ্ছে !"

সন্তু বলল, "আর-এক কাপ কফি আনব ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, একটু হাঁটাহাঁটি করে দেখি তো ! আমার ক্রাচ দুটো কোথায় গেল ?"

সন্তু বলল, "এই তো, খাটের পাশেই রয়েছে !"

কাকাবাবু সেদিকে তাকিয়ে অবাকভাবে বললেন, "ক্রাচ দুটো রয়েছে ? সব কিছু ঠিকঠাক আছে ? তবু আমি ঘুমোচ্ছি কেন ?"

বিছানা থেকে নেমে তিনি ক্রাচ বগলে নিয়ে বারান্দায় এলেন। বেশ জোরে-জোরে চলে গেলেন খানিকটা। আবার ফিরে এসে বললেন, "নাঃ, মনে পড়ছে না ! কাল রাত্তিরে আমি আর দেবলীনা বসে ছিলাম এখানে, একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছিল, আকাশে মেঘ ছিল না, বই পড়ছিলাম দু'জনে...তারপর কী হল ?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "দেবলীনা কাল রাত্তির থেকেই নেই ?"

কাকাবাবু বললেন, "যাঃ, তা কি হয় ? দেবলীনার কোনও বিপদ হলে আমি কি বিছানায় নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমোতে পারি ? আমি যখন খাটে গিয়ে শুয়েছি, তখন দেবলীনাও নিশ্চয়ই আগে শুতে গিয়েছিল। ঠিক কি না বল ?"

সন্তু চুপ করে রইল।

জোজো বলল, "দেবলীনা কোথাও লুকিয়ে থেকে আমাদের সঙ্গে মজা করছে না তো ? এতগুলো ঘর, কেউ লুকিয়ে থাকলে ধরবার উপায় নেই !"

সন্তু বলল, "তা হয় নাকি ? কাকাবাবুকে অসুস্থ দেখেও দেবলীনা এতক্ষণ ইচ্ছে করে বাইরে থাকতে পারে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি অসুস্থ ? কিসের অসুখ ? তবে কিছু মনে করতে পারছি না, এটাও ঠিক !"

এই সময় বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ হল। এই নিস্তব্ধ জায়গায় গাড়ির আওয়াজ এমনই অস্বাভাবিক যে, চুপ করে গেল সবাই। গাড়িটা এদিকেই আসছে। গেটের বাইরে এসে থামল। তারপর একজন কেউ ডাকল, "রায়চৌধুরীবাবু ! রায়চৌধুরীবাবু !"

সন্তু কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকাতেই কাকাবাবু বললেন, "এ তো মনে হচ্ছে দারুকেশ্বর ওঝা ! সন্তু, যা তো, দ্যাখ, ওই বড় গেটটার নীচে একটা ছোট গেট আছে, সেটা খুলে দিয়ে আয়। ওই দারুকেশ্বর কিছু জানতে পারে।"

তারপর তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "যাচ্ছে, দরজা খুলে দিচ্ছে !"

সন্তু জোজোর কাছ থেকে টর্চ নিয়ে ছুটে গেল। কাকাবাবু রেলিংয়ের কাছে এসে ওদের দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আবার ঘুমে ঢলে পড়লেন।

দারুকেশ্বর ওপরে উঠে এসে বলল, "রায়চৌধুরীবাবু, কী হয়েছে? কী সব শুনছি!"

কাকাবাবু চোখ মেলে বললেন, "কে? কে আপনি?"

দারুকেশ্বর খানিটা থতমত খেয়ে গিয়ে বললেন, "সে কী, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি দারুকেশ্বর!"

কাকাবাবু ক্রাচ ঠকঠকিয়ে এগিয়ে এসে দারুকেশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে অতিকষ্টে চোখ খুলে বললেন, "হ্যাঁ, দারুকেশ্বর, দেবলীনা কোথায়?"

দারুকেশ্বর বলল, "দেবলীনা-মামণি কোথায় তা তো আমি জানি না! আপনি একটা গাড়ি ভাড়া করে আনতে বলেছিলেন, সকালে গাড়ি নিয়ে এসে শুনলুম আপনি ঘুমোচ্ছেন। এক ঘন্টা বাদে ঘুরে এসে দেখি তখনও আপনি ঘুমোচ্ছেন! আমার জঙ্গলে একটু কাজ ছিল, সেখানে চলে গেলুম গাড়িটা নিয়ে। দুপুর দেড়টার সময় আবার এসে দেখি, তখনও আপনার ঘুম ভাঙেনি। আমি আর ডিসটার্ব করলুম না। দেবলীনাকেও দেখতে পাইনি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কাল রাত্তির থেকে আজ এই এত রাত্তির পর্যন্ত ঘুমিয়েছি? এ-কখনও সম্ভব? আমার জীবনে কক্ষনো এমন হয়নি! ওই শশাবাবুকে ডাকুন তো!"

দারুকেশ্বর বলল, "ও ব্যাটাকে তো এখান থেকে ডাকলে আসবে না। ধরে আনতে হবে। রোজ এই সময় গাঁজা খেয়ে পড়ে থাকে। দুর্যোধন কোথায়?"

দারুকেশ্বর বারান্দা দিয়ে গলা বাড়িয়ে হাঁক পাড়ল, "দুর্যোধন! দুর্যোধন!"

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

সন্তু বলল, "চল তো জোজো, তুই আর আমি ওই শশাবাবুকে ধরে নিয়ে আসি!"

ওরা ছুটে চলে যাবার পর দারুকেশ্বর বলল, "কাল রাত্তিরে আবার কিছু ভয়-টয় পাননি তো? আমি বলেছিলাম সার্কিট হাউসে থাকতে। বেশ চারদিকে বেড়াতে যেতে পারতেন। এ-বাড়িটা ভাল না!"

কাকাবাবু বললেন, "কাল রাত্তিরে? কী হয়েছিল কাল রাত্তিরে? আঃ! কিছু মনে পড়ছে না! মাথাটায় কে যেন তালা লাগিয়ে দিয়েছে, কিছুতেই বুদ্ধি খুলছে না।"

কাকাবাবুর যেন দারুণ কষ্ট হচ্ছে, কুঁকড়ে গেছে মুখটা। তিনি এক হাতে নিজের মাথার চুল ধরে এমন জোরে টানলেন, যেন সব চুল উপড়ে আসবে!

দারুকেশ্বর চমকে গিয়ে বলল, "মনে পড়ছে না? আপনাকে কেউ শল্যকরণী খাইয়ে দেয়নি তো?"

কাকাবাবু বললেন, "শল্যকরণী? সে আবার কী?"

"আছে, আছে, সে একটা বড় সাঙ্ঘাতিক গাছের বীজ। যদি কেউ খাইয়ে দেয়, তা হলে মনে হবে আপনার গায়ে শত-শত বাণ বিঁধছে! তারপর আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন! সে বড় ভয়ঙ্কর ঘুম! থাক ভয় নেই। আমার কাছে বিশল্যকরণী ওষুধ আছে, গন্ধমাদন পাহাড় থেকে জোগাড় করেছি। সে ওষুধের খোঁজ এখন কেউ রাখে না, শুধু আমি জানি। আজ রাতেই আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দেব!"

"দেবলীনা কোথায় গেল?"

"আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে কী জানেন? এই রাজবাড়ির একজন গুরুদেব ছিলেন, আপনাকে বলেছিলাম। তাঁর নাম খগেশ্বর আচার্য। লোকে বলে তিনি এখনও দেখা দেন মাঝে-মাঝে, তিনি দিব্য-দেহ ধারণ করতে পারেন, তাঁর বয়েস একশো বছরের বেশি। আমি হিসেব করে দেখলুম, অত বয়েস হবে না, আমি তো এক সময় দেখেছি তাঁকে, এখন বেঁচে থাকলে তাঁর বয়েস পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর হত। লোকে যখন মাঝে-মাঝে তাঁকে দেখতে পায়, তা হলে তিনি বোধহয় বেঁচেই আছেন। আপনারাও তো পরশু রাতে তাঁকে একবার দেখেছিলেন। সেই গুরুদেবই দেবলীনাকে ধরে নিয়ে গেছেন হয়তো! তিনি চম্পাকে খুব ভালবাসতেন!"

"পরশু রাতে দেখেছিলুম। কাল রাতে কী হল? সেই বুড়োটা চম্পাকে ধরে নিয়ে কোথায় যাবে?"

"তা জানি না। গুরুদেব যদি বেঁচেই থাকেন, তা হলে কোনও একটা জায়গায় তাঁকে থাকতে হবে নিশ্চয়ই। খাওয়াদাওয়া করতে হবে। শুধু হাওয়া খেয়ে তো মানুষ দেহ ধরে বাঁচতে পারে না? কী বলেন! আমি কাল জঙ্গলে একটা আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে শুনলাম, গোনাসিকা পাহাড়ে নাকি এক সাধুর আশ্রম আছে। সেই সাধুকে সহজে কেউ দেখতে পায় না, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তিনি জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যান, তিনি কখনও-কখনও স্বর্গ থেকে ঘুরে আসেন, এইসব আর কী! আদিবাসীরা রোজ তাঁর আশ্রমের সামনে ফলমূল রেখে আসে। এখন জঙ্গলের সেই সাধু আর রাজাদের গুরুদেব একই নন তো? চম্পার মৃত্যুর পর তিনি প্রায় পাগলের মতন হয়ে রাজবাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছিলেন কেউ জানে না!"

কাকাবাবু আপন মনে বললেন, "চম্পা আর দেবলীনা। দেবলীনা আর চম্পা! মাঝখানে পনেরো বছর! দক্ষিণের ঘর থেকে সেই সাধু বেরলো কী করে!"

জোজো আর সন্তু দু' হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল শশাবাবুকে। সে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "আমি তো রান্না করে দিচ্ছি বাবু! দেব না সে-কথা তো বলিনি!"

দারুকেশ্বর তাকে ধমক দিয়ে বলল, "রান্নার কথা কে জিজ্ঞেস করছে!

দেবলীনা-দিদিমণি কোথায় গেল ?”

শশাবাবু মাথা টিপে ধরে বলল, “আজ্ঞে, উনি কোথায় গেছেন, তা কি আমার জানার কথা ? আমায় তো কিছু বলে যাননি। তবে সকালবেলা ম্যানেজারবাবু এসেছিলেন, তিনি বললেন, দিদিমণিটি বড়-রাস্তায় গিয়ে বাস ধরে টাউনে চলে গেছেন। ওপরে যে-বাবু ঘুমোচ্ছেন, তাঁকে খবর দিতে বলেছেন !”

“ম্যানেজারবাবু মানে মনোজবাবু ? তিনি এসেছিলেন, আবার কোথায় গেলেন ?”

“তিনি বললেন, তাঁর বাড়িতে কার অসুখ, তাই তিনি আবার চলে যাচ্ছেন। থাকতে পারবেন না।”

“মেয়েটা এমনি-এমনি শহরে চলে গেল, একলা-একলা ?”

“মনোজবাবু তো সেই কথাই বললেন। তার বেশি তো আমি কিছু জানি না, বাবু !

“দুর্যোধন কোথায় ?”

“সে ব্যাটার কখনও পাত্তা পাওয়া যায় ? সে সাইকেল নিয়ে বাজারে চলে গিয়ে গাঁজা খায় !”

“দুর্যোধন বলে, তুমি গাঁজা খাও। আর তুমি বলছ সে গাঁজা খায়। বাঃ, বেশ বেশ !”

কাকাবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিলেন, আবার ঘুমে ঢুলে আসছিল তাঁর চোখ। এবারে তিনি সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিলেন। তারপর পাঞ্জাবির এ-পকেট ও-পকেট খুঁজে রিভলভারটা পেয়ে গিয়ে বার করে আনলেন।

শশাবাবুই প্রথম সেটা দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠে বলল, “ও কী, বাবু, আমায় মারবেন না। আমায় মারবেন না। আমি কিছু মিছে কথা বলিনি ! মনোজবাবু যা বলেছেন...”

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, “চুপ, সবাই চুপ ! একটু দূরে সরে যাও !”

তিনি রিভলভারের সেফটি ক্যাচ খুলে, চেম্বারটা একবার দেখে নিয়ে, নলটা ধরলেন নিজের কানের কাছে। তারপর ট্রিগারে আঙুল দিলেন।

সন্তু ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, “কাকাবাবু, ও কী করছ ? ও কী ?”

দারুকেশ্বর ফিসফিস করে বলল, “এই রে ! শল্যকরণী ! শল্যকরণী ! বোধবুদ্ধি সব লোপ পায়।”

কাকাবাবু অন্য একটা হাতের আঙুল ঠোঁটের কাছে নিয়ে বললেন, “চুপ। কোনও কথা নয়। সবাই একটু দূরে সরে যাও !”

তারপর তিনি ট্রিগার টিপলেন। প্রচণ্ড জোরে শব্দ হল, গুলিটা লাগল বারান্দার সিলিংয়ে, অনেকটা সুরকি ইট-বালির চাপড়া খসে পড়ল।

কাকাবাবু এবারে রিভলভারটা পকেটে ভরে দু' হাতে কান চেপে ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন জোরে জোরে।

সন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "এবারে কাকাবাবুর ঘুম কেটে যাবে।"

জোজো বলল, "বাপ রে, আমারই কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম।"

এতক্ষণ পরে কাকাবাবুর মুখে একটু হাসি ফুটে উঠেছে। তিনি আস্তে-আস্তে বললেন, "এতক্ষণ এই বুদ্ধিটা কিছুতেই মাথায় আসছিল না। শব্দই একমাত্র ওষুধ! খুব জোর শব্দ শুনলে ঘোর কেটে যায়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এবারে সব মনে পড়েছে?'

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়া, দাঁড়া, একটু একটু করে মনে করছি। দুপুরবেলা পুকুরধারে...শিবমন্দির...সেখানে সুড়ঙ্গ...তার মধ্যে কিছু নেই। এক জায়গায় বন্ধ! দারুকেশ্বর, ওই শিবমন্দিরের তলায় যে সুড়ঙ্গ আছে, তা আপনি জানতেন?"

"না, স্যার। শুনিনি কখনও।"

"শশাবাবু, তুমি জানতে?"

"আজ্ঞে না। কোনও সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গের কথা তো আমি জানি না!"

"ঠিক আছে, শশাবাবু, তুমি যাও!"

শশাবাবু চলে যাবার পর কাকাবাবু বললেন, "সুড়ঙ্গ একটা আছে ঠিকই। আমি নিজে তার মধ্যে ঢুকে দেখেছি। সেটা বেশ লম্বা, তবে মাঝখানটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত অনেক পুরনো আমলের সুড়ঙ্গ, এখন সবাই ভুলে গেছে সেটার কথা। সেই সুড়ঙ্গের সঙ্গে ওই দক্ষিণের কোণের ঘরে কোথাও যোগ আছে নিশ্চয়ই, সেটা আমি খুঁজে পাইনি! তারপর কী হল?" দেবলীনা একা জঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছিল, আমি তাকে বারণ করিনি। সে কিন্তু ঠিক ফিরে এসেছিল, কোনও বিপদ হয়নি তার! শুধু সে জঙ্গলে কোনও একটা লোককে দেখতে পেয়েছিল, লোকটা দেবলীনাকে দেখেই লুকিয়ে পড়ে। সে কিন্তু এই বুড়ো সাধু নয়। তারপর?"

সবাই ব্যগ্র হয়ে শুনছে। কাকাবাবু আবার দু' কানে হাত দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন।

"এরপর সন্ধেবেলা আর কিছু হয়নি। আমরা খাওয়াদাওয়া ঠিকঠাক করেছি। তারপর...তারপর... ওঃ হো, আমিই একটা দারুণ ভুল করেছিলুম। আমি দেবলীনার অবচেতন মনের কথা বার করবার জন্যে ওকে হিপনোটাইজ করতে গেলুম। তাতে ফল হল উলটো, দেবলীনা হঠাৎ চম্পা হয়ে গেল, আমাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল দৌড়ে। কোথায় যেন গেল, কোথায় যেন...ওঃ হো, জঙ্গলের মধ্যে একটা বালির টিপির ওপরে। সেখানে সে বারবার যায় কেন? নিশ্চয়ই সেখানে কিছু আছে। সন্তু, সন্তু, চল্ তো, এক্ষুনি ওই জায়গাটা খুঁজে দেখতে হবে। বড্ড দেরি হয়ে গেছে, কাল রাত আর আজ রাত..."

কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে দ্রুত চলতে শুরু করলেন। সন্তু, জোজো, দারুকেশ্বর, সবাই তাঁর সঙ্গ নিল। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটা জিপগাড়ি। তার ড্রাইভার ঘুমোচ্ছে। দারুকেশ্বর জিজ্ঞেস করল, "রায়চৌধুরীবাবু, গাড়িটায় যাবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, গাড়িটা থাক। ওই জঙ্গলে গাড়ি ঢুকবে না। ইস, এখনও কেন মনে করতে পারছি না যে, ওই পর্যন্ত যাবার পর আমার কী হল ? কী করে আমি ফিরে এলাম নিজের বিছানায় ?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "দেবলীনা চম্পা হয়ে গেল, তার মানে কী ?"

কাকাবাবু বললেন, "সে-সব তুই পরে শুনবি। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, এ-বাড়িতে চম্পা নামে এক রাজকন্যা ছিল, সে খুব রহস্যময়ভাবে মারা যায়। পনেরো বছর আগে। আমাদের দেবলীনাকে ঠিক সেই চম্পার মতন দেখতে।"

জোজো বলল, "গিনেস বুক অব রেকর্ডস'-এ আছে, আমেরিকার মেমফিস শহরের একটা মেয়ে আর পাপুয়া নিউগিনির একটা মেয়েকে হুবহু একরকম দেখতে। গলার আওয়াজ পর্যন্ত একরকম। অথচ দু'জনের বাড়ির মধ্যে হাজার হাজার মাইল তফাত ! আমি ওদের দু'জনের ছবি দেখেছি, ওদের দু'জনকে চম্পার মতনই দেখতে। গিনেস বুককে খবরটা জানানো উচিত, তিনটি মেয়েই একরকম চেহারার !"

সন্তু বলল, "তিনজন না, চারজন !"

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে কাকাবাবু বললেন, "এইবার আর-একটা কথা মনে পড়ল। এখানে এসে আমি দেবলীনার গান শুনতে পেয়েছিলাম। অথচ এমনিতে দেবলীনা গান করে না। গানের শব্দটা কোন্ দিক থেকে আসছিল। ওই ডান দিক থেকে ! দারুকেশ্বরবাবু, আপনি এই জঙ্গলে কখনও ওষুধ খুঁজতে আসেননি ?"

"দারুকেশ্বর বলল, "না ! এখানে সেরকম কিছু নেই, বড়-বড় গাছ শুধু !"

সন্তু আর জোজো আগে-আগে দৌড়ে যাচ্ছে। সকলের হাতে টর্চ। ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছে সামনে সেই বালির টিলাটা দেখে কাকাবাবু থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর চিবুক কঠিন হয়ে গেল, চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল।

তিনি দারুকেশ্বরের দিকে ফিরে বললেন, "আরও খানিকটা মনে পড়ে গেছে। এইখানে, ঠিক এইখানে সেই বুড়ো সাধুটা হঠাৎ এসে উদয় হয়েছিল। চমকে দিয়েছিল আমাকে, আমি সাবধান হবার সময় পাইনি। বুড়োটা আমাকে হিপনোটাইজ করল, আমি কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারলাম না। তারপরেই নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে গেছি।"

দারুকেশ্বর বলল, "সাধু-সন্ন্যাসীদের এ-রকম অলৌকিক ক্ষমতা থাকে। রাজাদের সেই গুরুদেব যদি হন..., আমি শুনেছি, তিনি খুব বড় তান্ত্রিক

ছিলেন !"

"অলৌকিক ক্ষমতা না ছাই ! আমিও ইচ্ছে করলে লোককে অজ্ঞান করে দিতে পারি। কিন্তু বুড়োটা আমাকে তৈরি হবার সময় দেয়নি। যদি আর-একবার তার দেখা পাই..."

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, দেবলীনা কোথায় ছিল ?"

কাকাবাবু বললেন, "এই ছোট টিলাটার মাথার কাছে তাকে শেষ দেখেছি। এই বালির টিলাটার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে। লোকজন জোগাড় করে এটা খুঁড়ে দেখতে হবে !"

সন্তু দৌড়ে টিলাটার মাথায় উঠে গেল, তারপর নেমে গেল উলটো দিকে। জোজোও গেল তার পেছনে। তারপর দু'জনে টিলাটার এদিক-ওদিক ঘুরে দেখতে লাগল। দু'জনের হাতে টর্চ জ্বলছে।

এক সময় সন্তু চেঁচিয়ে বলে উঠল, "কাকাবাবু, এখানে একটা লাল রিবন ! ঝোপে আটকে আছে। দেবলীনা মাথায় রিবন বাঁধে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, কাল ওর মাথায় রিবন ছিল। ওই জায়গাটা ভাল করে খুঁজে দ্যাখ তো !"

সন্তু আবার বলল, "ঝোপের মধ্যে একটা আলগা বড় পাথর, মনে হচ্ছে একটা গুহার মুখে চাপা দেওয়া।"

জোজো বলল, "এই, সাবধান। এইসব গুহার মধ্যে বড়-বড় মাকড়সা থাকে !"

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো দারুকেশ্বরকে দিয়ে বললেন, "আপনি এগুলো ধরুন তো। এখানে আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হবে ! বালিতে ক্রাচ বসে যাবে।"

সন্তু আর জোজো ততক্ষণে ঝোপের আড়ালের পাথরটা সরিয়ে ফেলেছে। কাকাবাবু সেখানটায় এসে ভেতরটায় একটু উঁকি মেরে বললেন, "গুহা নয়, সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গের আর-একটা মুখ। এটাকে লুকোবার জন্যই এককালে এখানে বালি-পাথর এনে টিলাটা তৈরি করা হয়েছিল। এখানে বসে কেউ গান গাইলে ভেতর থেকে শুনতে পাওয়া যাবে, তাই না ?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু দেবলীনা এখানে এসে শুধু-শুধু গান গাইবে কেন ? ওর কি মাথায় বুদ্ধি নেই ?"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বুদ্ধির ব্যাপার নয় রে। সব রহস্য আমিও জানি না, বুঝতে পারিনি এখনও। খুব সম্ভবত ওই বুড়ো সন্ন্যাসীটা কোনও সময় দেবলীনার কাছে এসে ওকে হিপনোটাইজ করে ওর মনের মধ্যে চম্পার ছবিটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। যাতে ওর মধ্যে চম্পার চরিত্রের লক্ষণগুলো আস্তে-আস্তে ফুটে ওঠে।

"দেবলীনা সে-কথা বলেনি তোমাকে ?"

"সজ্ঞান অবস্থায় তো এসব মনে থাকে না। দ্যাখ না, আমিই তো সব ভুলে গিয়েছিলাম। এখনও মনে করতে পারছি না, কী করে এখান থেকে ফিরে গেলাম বিছানায়।"

"কাকাবাবু, এই সুড়ঙ্গের মধ্যে আমি ঢুকি ?"

"তুই না, আগে আমি। সেই বুড়োটার শক্তি সাঙ্ঘাতিক। শোন্, একটা কথা বলে রাখি। যদি পাকা-চুল আর দাড়িওয়ালা কোনও বুড়োকে দেখতে পাস, সঙ্গে-সঙ্গে চোখ ঢাকা দিয়ে ফেলবি। ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু ওর দিকে তাকাবি না !"

জোজো বলল, "আমার বাবা ওয়ার্ল্ড হিপনোটিজম কমপিটিশনে পরপর দু'বার ফার্স্ট হয়েছেন। আমি ওসব বুড়ো-ফুড়ো গ্রাহ্য করি না !"

সন্তু বলল, "তোর বাবা ফার্স্ট হয়েছেন, তুই তো ফার্স্ট হোসনি ! তুই আমার পেছনে থাকবি।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই টর্চ ধর। আমাকে হাতে ভর দিয়ে নামতে হবে।"

কাকাবাবু সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আজ আর এর মধ্যে মশাল জ্বলছে না। টর্চের আলোয় পা টিপে-টিপে এগোতে হচ্ছে। কাকাবাবুর হাতে রিভলভার। আজ তিনি ঠিক করেই ফেলেছেন যে, সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখলেই তার পায়ে গুলি করবেন। লোকটি জীবিত, না প্রেতাত্মা, তা আজ জানতেই হবে !"

দারুকেশ্বর হঠাৎ এক সময় বলে উঠল, "গন্ধ পাচ্ছি। আমি গন্ধ পাচ্ছি ! খুব খারাপ গন্ধ ! সেই গন্ধ !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "সেই গন্ধ মানে ? কিসের গন্ধ ?"

দারুকেশ্বর কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "ওনাদের গন্ধ। রাত্তিরে নাম করতে নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আস্তে, কেউ কথা বলবে না। সামনে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে।"

দারুকেশ্বর বলল, "রায়চৌধুরীবাবু, ফিরে চলুন। আমার অনুরোধ, আর যাবেন না। এখানে জ্যান্ত মানুষ কেউ নেই, শুধু ওনারা রয়েছেন !"

কাকাবাবু বললেন, "এটা কী দেখুন তো ? চিনতে পারেন ? সন্তু, আমার হাতে এবার টর্চটা দে !"

সেই ঘরের মতো জায়গাটায় পৌঁছে গেছে ওরা। মেঝেতে ত্রিশূল পোঁতা রয়েছে, শুকনো ফুল-পাতা ছড়ানো, সেইখানে অনেক আতপ চাল, অর্ধেক পোড়া ধূপকাঠি, এক হাঁড়ি দই, অনেকগুলো টাটকা জবাফুল, একটা আস্ত কাতলা মাছ, কয়েকটা মাটির প্রদীপ।

কাকাবাবুর টর্চটা যেখানে থেমে গেল, সেটা একটা কঙ্কাল, তার গায়ে

লালপাড় শাড়ি জড়ানো। তার করোটিতে মাখানো রয়েছে চন্দন।

জোজো সন্তুর হাত চেপে ধরে বলল, "ভূ-ভূ-ভূ-ভূত !"

সন্তু বলল, "চুপ !"

কাকাবাবু দারুকেশ্বরকে বললেন, "আপনি যে গন্ধ পেয়েছিলেন, সেটা ধূপের গন্ধ। একটু আগে এখানে মানুষজন ছিল। এখন যেটা পড়ে আছে, সেটা একটা কঙ্কাল। কঙ্কাল আর ভূত কি এক ?"

দারুকেশ্বর দু'দিকে মাথা দোলাল।

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কার কঙ্কাল, তা আন্দাজ করতে পারেন ?" গায়ে যখন শাড়ি জড়ানো, তখন কোনও মেয়ের বলেই মনে হয় !"

দারুকেশ্বর বলল, "খুব সম্ভবত এই হচ্ছে চম্পা। তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাকে কেউ এই সুড়ঙ্গ-পথে নিয়ে এসেছিল !"

কাকাবাবু বললেন, "আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। এই সুড়ঙ্গটা সামনের দিকে আরও গেছে। ওদিকটাও দেখতে হবে।"

জোজো অনেকটা সামলে নিয়ে পকেট থেকে একটা ক্যামেরা বার করে বলল, "কাকাবাবু, এই জায়গাটার একটা ছবি তুলতে পারি ? আমার ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ আছে। ছবিটা গিনেস বুক অব রেকর্ডসে পাঠাব। শাড়ি-পরা কঙ্কালের ছবি ওয়ার্ল্ডে আগে কেউ তুলতে পারেনি।"

কাকাবাবু আর দারুকেশ্বর এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। অনেক যত্ন নিয়ে এই সুড়ঙ্গটা কাটা হয়েছিল, তা বোঝা যায়। দু'দিকের দেয়াল বেশ মসৃণ। কোথাও মাকড়সার জাল নেই। দেখে বোঝা যায় যে, সম্প্রতি এটা ব্যবহার করা হয়েছে। খানিকটা এগোবার পর কাকাবাবু দেখতে পেলেন, এক জায়গায় অনেকগুলো লম্বা লম্বা রঙিন কাঠের টুকরো পড়ে আছে।

কাকাবাবু বললেন, "খুব সম্ভবত এগুলো ছবির ফ্রেম। চোরেরাও এই সুড়ঙ্গটা ব্যবহার করে মনে হচ্ছে। রাজবাড়িতে অনেক ঘরের দেয়ালে আমি চৌকো-চৌকো সাদা দাগ দেখেছি, বোধ হয় সেখানে কিছু মূল্যবান ছবি ছিল। চোরেরা ফ্রেম খুলে ছবি নিয়ে গেছে।

দারুকেশ্বর বলল, "চোরেরা ছবিও নেয় বুঝি ?"

কাকাবাবু হাসলেন। তারপর বললেন, "অবশ্য, সেই সব চোরদের ছবির সমঝদার হতে হবে। সাধারণ চোরে নেবে না।"

এক জায়গায় সুড়ঙ্গটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। সামনে একটা দরজা। ডান দিক দিয়ে আর-একটা সুড়ঙ্গ ওপরের দিকে উঠে গেছে, ছোট-ছোট সিঁড়ি রয়েছে সেদিকে।

কাকাবাবু বললেন, "শিবমন্দিরের দিক দিয়ে ঢুকে আমি একটা দরজা দেখেছিলাম। মনে হচ্ছে এইটাই। দরজাটা এদিক থেকে শেকল তোলা। এ-দরজা দিয়ে কেউ যায়নি। আমি ডান দিকটা দিয়ে যেতে চাই।"

দারুকেশ্বরের কাছ থেকে ক্রাচ দুটো চেয়ে নিয়ে কাকাবাবু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। কুড়ি-পঁচিশটা সিঁড়ির পরেই আর-একটা দরজা। এটাও ভেতর দিক থেকেই শেকল তোলা। কাকাবাবু শেকল খুলে দরজাটায় একটা ধাক্কা দিলেন। তারপর টর্চ ফেলে দেখলেন সেটা একটা বাথরুম।

ভুরু কুঁচকে তিনি বললেন, "এ আবার কোথায় এলাম?"

বাথরুমের পরে একটা খালি ঘর। তারপর একটা বারান্দা। এবার স্পষ্ট বোঝা গেল। ওঁরা রাজবাড়ির দোতলায় উঠে এসেছেন। যে-ঘরটা থেকে এইমাত্র কাকাবাবুরা বেরিয়ে এলেন, সেটা দক্ষিণের কোণের ঘরের দুটি ঘর আগে।

কাকাবাবু অনুচ্চ গলায় হেসে বললেন, "এবার বোঝা গেল! দক্ষিণের কোণের ঘর সম্পর্কে এমন একটা গুজব ছড়ানো আছে যে, আমরা শুধু ওখানেই পথ খুঁজেছি। কিন্তু অন্য কোনও ঘর থেকেও তো দক্ষিণের ওই কোণের ঘরে যাওয়া যায়!"

দারুকেশ্বর বলল, "চম্পাকেও বোধহয় এইরকম কোনও পথ দিয়েই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রায়চৌধুরীবাবু, এবার আমাদের পুলিশে খবর দেওয়া উচিত!"

৯

একটা সুন্দর লাল রঙের বেনারসি পরানো হয়েছে দেবলীনাকে। সে ঘুমিয়ে আছে একটা ধপধপে সাদা চাদরের ওপর। একটা মস্ত বড় ধুনুচি থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। তার সামনেই সেই মুণ্ডুসমেত বাঘছালটার ওপর চোখ বুজে বসে আছেন গুরুদেব।

পাহাড়ের গায়ে এই আশ্রম-ঘর। ছোট্ট একটা গুহার সামনে খড়ের ছাউনি। তার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা ঝরনা। সেই ঝরনা থেকে কমণ্ডলুতে জল ভরে নিয়ে মনোজ এসে ঢুকল আশ্রমের মধ্যে।

তার পায়ের শব্দ শুনে গুরুদেব চোখ মেলে তাকিয়ে বললেন, "এবার সময় হয়েছে।"

ঝরনার জল দেবলীনার চোখেমুখে ছিটিয়ে দিয়ে তিনি কোমল স্বরে বললেন, "চম্পা জাগো, চম্পা জাগো!"

চম্পার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে তিনি বারবার ওই কথা বলতে লাগলেন। আস্তে চোখ মেলে দেবলীনা বলল, "আমার চোখ জ্বালা করছে!"

গুরুদেব বললেন, "মনোজ, ধুনুচিটা বাইরে নিয়ে যাও!"

তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ, চম্পা?"

দেবলীনা বলল, "আমি ভাল আছি গুরুদেব। আমার আর কোনও কষ্ট

নেই। আমি এখন বাড়ি যাব।"

গুরুদেব বললেন, "হ্যাঁ, তুমি তোমার বাবার কাছে যাবে। উঠে বোসো, মনোজ তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে। তোমার বাবার নাম কী, মনে আছে তো ?"

দেবলীনা ঘাড় হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ, মনে আছে। আমার বাবার নাম রণদুর্মদ ভঞ্জদেও।"

গুরুদেব মনোজের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর আবার দেবলীনাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মাকে মনে পড়ে তোমার ? কী ছিল মায়ের নাম ?"

"রানী হর্ষময়ী। আমার একটা ছোট্ট ভাই ছিল, তার নাম রণদুর্জয়, সে বাচ্চা-বয়েসে স্বর্গে চলে গেছে। আমার মা-ও সেখানে চলে গেছে।"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, তোমার ছোট ভাই তোমার মায়ের কাছে আছে। কিন্তু তোমার বাবা তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। তোমাকে দেখলে তিনি কী খুশিই হবেন ! চম্পা, বলো তো তোমার কী হয়েছিল ?"

"চোরেরা আমাকে চুরি করে নিয়ে মেরে ফেলেছিল। আপনি মন্ত্র দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আপনি আমাকে এতদিন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন।"

"বেঁচে উঠে তোমার ভাল লাগছে ?"

"হ্যাঁ, খুব ভাল লাগছে, গুরুদেব। আমি এখন স্বর্গে মায়ের কাছে যেতে চাই না। আমি এখন বাবার কাছে যাব।"

"হ্যাঁ, তা-ই যাবে। তুমি তোমাদের কটকের বাড়িটা চিনতে পারবে ? মনে আছে সে-বাড়ির কথা ?"

"হ্যাঁ, সব মনে আছে। আমাদের বাগানে একটা পাথরের মূর্তির মুখ দিয়ে জল পড়ে। একটা ছোট চৌবাচ্চায় লাল-নীল মাছ আছে। দোতলার সিঁড়ির সামনে মস্ত বড় ঘড়ি। আমার বাবার ঘরে একটা রাধাকৃষ্ণের ছবি। সেই ছবির পেছনে লোহার সিন্দুক !"

"বাঃ, বাঃ, সব মনে আছে দেখছি ! তোমার বাবাকে তুমি যে-গানটা শোনাতে, সেই গানটা একটু গাও তো।"

দেবলীনা চোখ বুজে একটু মনে করার চেষ্টা করে গান ধরল :

প্রভু মেরে অবগুণ চিক ন ধরো
সমদরশী হৈ নাম তিহারো,
চাহে তো পার করো ॥···

গুরুদেবের চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল। তিনি গদগদ কণ্ঠে বললেন, "ধন্য, ধন্য ! আজ আমার সাধনা ধন্য ! সেই পনেরো বছর আগে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, চম্পাকে আমার সিদ্ধি দিয়ে, আমার আয়ু দিয়ে বাঁচিয়ে তুলব, তা যে এমনভাবে সার্থক হবে ভাবিনি ! করুণাময়ের কী বিচিত্র লীলা ! রাজা রণদুর্মদ তার মেয়েকে আবার ফিরে পাবে। এই চম্পা আর হারিয়ে যাবে না। মনোজ,

তুই ঠিকমতন একে এর বাবার কাছে পৌঁছে দিবি !”

মনোজ হাত জোড় করে বলল, “নিশ্চয়ই গুরুদেব, আমি অতি সাবধানে নিয়ে যাব।”

“তুই ব্যাটা অর্থলোভী, তা আমি জানি। চম্পার বাবা তোকে বখশিস দেবেন, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবি, আর বেশি কিছু লোভ করবি না ! মনে রাখিস, আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করলে তুই সারা পৃথিবীর কোথাও লুকোবার চেষ্টা করে নিষ্কৃতি পাবি না। আমি তোকে ঠিক টেনে নিয়ে আসব এখানে।”

মনোজ জিভ কেটে বলল, “সে কী কথা গুরুদেব ! আমি কখনও আপনার কথার অবাধ্য হতে পারি ? বুড়ো মেজোবাবু একলা থাকেন, আমি মনপ্রাণ দিয়ে ওঁদের সেবা করব।”

“রাজকুমারী চম্পা রাজেন্দ্রাণী হবে একদিন। এই আমি বলে গেলাম। সব সময় খেয়াল রাখবি, ওর যেন অযত্ন না হয়। পুলিশ দেখে ভয় পাবি না। হাজারটা পুলিশও প্রমাণ করতে পারবে না যে, ও চম্পা নয়। মা চম্পা, তোমাকে যদি কেউ কখনও তোমার বাবাকে ছেড়ে যেতে বলে, তুমি কি চলে যাবে ?”

দেবলীনা বলল, “না, কোনওদিন যাব না !”

“তুমি দেবলীনা নামে কারুকে চেনো ?”

“কে দেবলীনা ?”

“সে একটা মেয়ে, হারিয়ে গেছে। তুমি কলকাতা শহর দেখেছ কোনওদিন ?”

“সেই পাঁচ বছর বয়েসে একবার বাবা-মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম। গড়ের মাঠ, মনুমেন্ট, তার কাছে একটা হোটেল...”

“আর-একবার যাওনি ?”

“আর একবার হাওড়া স্টেশনে নেমে দার্জিলিংয়ের ট্রেনে উঠেছি।”

“ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ ! মা চম্পা, তোমার বাবার পিঠে কী দাগ আছে ?”

“পিঠে নয়, কাঁধে। চিতাবাঘে থাবা মেরেছিল।”

“শুনলি মনোজ, শুনলি ? চম্পা কিছুই ভোলেনি। সোনার মেয়ে চম্পা, ওকে ছেড়ে দিতে আমারও কষ্ট হচ্ছে। আমি মাঝে-মাঝে গিয়ে ওকে দেখে আসব। এবারে চম্পাকে আমি সাজিয়ে দিই।”

গুরুদেব উঠে গিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে একটা কুলুঙ্গি থেকে একটা ছোট পুঁটুলি নিয়ে এলেন। সেটার গিঁট খুলতে খুলতে বললেন, চম্পার দেহটা যখন আমি সুড়ঙ্গের মধ্যে নিয়ে আসি, তখন চম্পার গায়ে এই গয়নাগুলো ছিল। ওকে যারা মেরেছিল, তারা গয়নার জন্য মারেনি। এইগুলো আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার কাছ থেকে তো কেউ চুরি করতে আসবে না। আজ এইগুলো কাজে লেগে গেল।”

গয়নাগুলো চম্পার হাতে দিয়ে তিনি বললেন, "এগুলো পরে নাও তো মা ! বাবার কাছে যাবে, একেবারে নিরাভরণ হয়ে যেতে নেই।"

দু' হাতের চার গাছা করে সোনার চুড়ি, দু' কানের দুটি হীরের দুল, গলায় একটা মুক্তোর মালা, সব পরে নিল দেবলীনা। গুরুদেব মুগ্ধভাবে বললেন, "কী রকম ঠিক-ঠিক লেগেছে এতদিন পরেও ! এই তো আমাদের রাজকুমারী চম্পা !"

মনোজ বলল, "গুরুদেব, এবার ওকে নিয়ে যাই ? রাত অনেক হল।"

গুরুদেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। আমার বুকটা খালি-খালি লাগবে। তুই ওকে কী করে নিয়ে যাবি ?"

মনোজ বলল, "পাহাড়ের নীচে জঙ্গলের মধ্যে একটা গাড়ি লুকিয়ে রেখে এসেছি। কেউ টের পাবে না।"

গুরুদেব ধমক দিয়ে বললেন, "কেউ টের পেলেই বা ক্ষতি কী ! লুকোবার দরকার নেই। চম্পা আর কারুর কাছে যাবে না। আর কারুকে চিনবে না !"

মনোজ বলল, "ওঠো চম্পা, গুরুদেবকে প্রণাম করো !"

গুরুদেব চম্পার মাথায় হাত রেখে বললেন, "রাজ-রাজেশ্বরী হও, মা। সুখী হও। সবাইকে সুখী করো।"

মনোজও গুরুদেবকে প্রণাম করল। তারপর বলল, "চম্পা, এসো।"

চম্পা দু' এক পা এগিয়ে, আবার গুরুদেবের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "যাই গুরুদেব..."

মনোজ আর গুরুদেব দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে বললেন, "কী হল ? কী হল ?"

চম্পা অজ্ঞান হয়ে গেছে। গুরুদেব ফ্যাকাসেভাবে হেসে বললেন, "বেটির এখান থেকে চলে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু, রাজার মেয়ে, সে কি এই আশ্রমে থাকতে পারবে ? যেতে তো ওকে হবেই।"

তিনি আবার চম্পার মুখেচোখে জল ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে লাগলেন, "চম্পা, জাগো...চম্পা, জাগো..."

আবার চম্পা বড়-বড় চোখ মেলে তাকাল। খুব যেন অবাক হয়ে সে দেখল গুরুদেব আর মনোজকে।

গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে, চম্পা ? শরীর খারাপ লাগছে ? আজ সারাদিন খাওয়াও তো হয়নি কিছু। এ-সময় যে কিছু খেতে নেই।"

চম্পা উঠে বসে বলল, "এখন ঠিক আছি। কিছু হয়নি।"

"শরীর দুর্বল লাগছে না ?"

"না। আমি এখন যেতে পারব।"

"কোথায় যাবে মনে আছে ?"

"হ্যাঁ, কটকে আমার বাবা রাজা রণদুর্মদ ভঞ্জদেও-র কাছে।"

"মনোজ, শহরে নিয়ে গিয়েই আগে ওকে কিছু খেতে দিবি। এসো মা চম্পা।"

চম্পা বলল, "গুরুদেব, আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে তো ?"

গুরুদেব বললেন, "হ্যাঁ, হবে। নিশ্চয়ই হবে। আমি যাব তোমার বাড়িতে।"

চম্পা আর মনোজ আশ্রমের বাইরে বেরিয়ে আসার পর গুরুদেব দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে। তাঁর হাই উঠল। হঠাৎ যেন শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত লাগছে তাঁর, ঘুম পাচ্ছে।

চম্পা আর মনোজ নামতে লাগল ঝরনাটার গা দিয়ে দিয়ে। চম্পা যাতে হোঁচট খেয়ে পড়ে না যায়, সেইজন্য তার হাত ধরতে যেতেই চম্পা কড়া গলায় বলল, "না, আমার হাত ধরবে না। তুমি কর্মচারী, আমার হাত ধরছ কোন্ সাহসে ?"

মনোজ থতমত খেয়ে বলল, "না, না, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি ভাবছিলুম, তুমি যদি পড়ে যাও...।"

চম্পা বলল, "না, আমি ঠিক যেতে পারব !"

একটু পরে মনোজ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। গুরুদেবের সামনে সে সিগারেট খেতে পারেনি। সেও খুব ক্লান্ত। কাল রাত থেকে অনেক ধকল গেছে।

মনোজ সিগারেট ধরাতেই চম্পা ধমক দিয়ে বলল, "তুমি আমার সামনে সিগারেট খাচ্ছ, তোমার এত সাহস ?"

মনোজ এবার রীতিমত হকচকিয়ে বলল, "সিগারেট খাব না ?"

চম্পা বলল, "রাজকুমারীর সামনে সিগারেট খাবার আস্পর্ধা হয়েছে তোমার ? বাবাকে বলে দেব ! সিগারেট ফেলে দাও, মনোজ !"

মনোজ তাড়াতাড়ি সিগারেটটা ঝরনার জলে ছুঁড়ে দিল। তারপর সে অনুনয় করে বলল, "রাজকুমারী চম্পা, আমি একটা কথা বলব ? নীচে যে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি, তার ড্রাইভার নতুন লোক। ভাড়া-গাড়ি। তুমি এত গয়নাগাঁটি পরে থাকলে সে-লোকটার যদি মাথায় বদ মতলব আসে ? দিনকাল ভাল নয়। গয়নাগুলো খুলে আমার কাছে দাও !"

চম্পা বলল, "না !"

"শোনো রাজকুমারী, আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি, এখন গয়নাগুলো খুলে রাখো।"

"না !"

"লক্ষ্মী মেয়ে, অবুঝ হয়ো না। গয়নাগুলো এখন দাও, তুমি বাড়িতে পৌঁছলেই তোমাকে আবার দিয়ে দেব। বাড়িতে তোমার আরও কত গয়না আছে !"

"আমি ওই ভাড়া-করা গাড়িতে যাব না !"

"তা হলে এখান থেকে কটক যাব কী করে ? অনেক দূর।"

"আমি আমার বাবার গাড়িতে যাব। বাবার গাড়ি নিয়ে এসো।"

"তোমার বাবার এখন কোনও গাড়ি নেই। রাজবাড়ির আর কোনও গাড়ি নেই। এই ভাড়া-করা গাড়িতেই যেতে হবে।"

"তা হলে আমি যাব না। আমি গুরুদেবের কাছে ফিরে যাব !"

মনোজ খপ করে চম্পার হাত চেপে ধরে বলল, "ছেলেমানুষি কোরো না, চম্পা। যা বলছি তা-ই শোনো। ড্রাইভারটা নতুন, না হলে তোমাকে গয়নাগুলো খুলতে বলতুম না !"

চম্পা খুব জোরে ঠাস করে মনোজের গালে একটা চড় কষাল। নিজের হাতটা টেনে নিয়ে বলল, "তোর এত সাহস ! বলেছি না, আমার গায়ে হাত দিবি না ?"

মনোজ নিজের গালে হাত বুলোতে-বুলোতে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল কয়েক পলক। চম্পা কিংবা দেবলীনা দু'জনেই নরম স্বভাবের মেয়ে। এই মেয়ে যে তাকে এত জোরে চড় মারতে পারবে, সে কল্পনাই করতে পারেনি। কিন্তু চড় খেয়ে তার মাথায় রাগ চড়ে গেছে।

সে এবার গম্ভীর গলায় বলল, "দ্যাখো, মেয়ে, আমার সঙ্গে বেশি চালাকি করো না ? মনে রেখো, আমার জন্য তুমি রাজকুমারী হতে যাচ্ছ। এরপর মহা সুখে থাকবে !"

চম্পার দু' চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল, দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, "দ্যাখ মনোজ, আমি কে তুই জানিস ? আমি পনেরো বছর আগে মরে গিয়ে ভূত হয়েছিলাম। এখন অন্য-একটা মেয়ের শরীরে ঢুকে পড়েছি। ফের যদি আমার গায়ে হাত দিস তুই, আমি তোর চোখ খুবলে নেব। তোর রক্ত চুষে খাব !"

মনোজ চম্পার এই মূর্তি দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে দু'এক পা পিছিয়ে গেল। তারপর সে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে উঁচু করে বলল, "কী, তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ? আমি গুরুদেবের চ্যালা, আমি অত সহজে ভয় পাই না !"

চম্পা এক পা এগিয়ে এসে বলল, "তুই আমাকে মারবি ? মার তো দেখি তোর কত সাহস ! আমার গায়ে মারলেই তা গুরুদেবের গায়ে লাগবে, তুই জানিস ! আয়, ওই পাথর ছুঁড়ে মার আমাকে। দ্যাখ, আমি ওই পাথরটা খেয়ে ফেলব !"

মনোজ আস্তে পাথরটা ফেলে দিয়ে বলল, "না চম্পা, আমি কি তোমাকে মারতে পারি ? তুমি আমাদের রাজকন্যা, তোমাকে আমরা সবাই ভালবাসি..."

চম্পা বলল, "তুই আমাকে মারতে পারলি না তো, তবে দ্যাখ !"

চম্পা চোখের নিমেষে নিজে দু'হাতে দুটো পাথর তুলে নিল। সঙ্গে-সঙ্গেই সে দুটি ছুঁড়ে মারল মনোজের দিকে। মনোজ দু'হাতে মুখ ঢেকে আত্মরক্ষা

করার চেষ্টা করল। চম্পার একটা পাথর লাগল তার পিঠে, বড় পাথরটাই লাগল তার মাথার খুলিতে।

খুব জোরে আঘাত পেয়ে মনোজ বসে পড়ল মাটিতে। চম্পা সঙ্গে-সঙ্গে ছুট দিল বনের মধ্যে।

মিনিট-খানেক ঝিম মেরে বসে রইল মনোজ। তারপরেই তার খেয়াল হল যে, চম্পা পালিয়ে যাচ্ছে, চম্পা হাতছাড়া হয়ে যাবে। যন্ত্রণা সহ্য করেও সে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল চম্পার পেছনে-পেছনে।

জঙ্গলের মধ্যে চম্পার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল মনোজ। এক-একবার সে দেখতেও পাচ্ছে। পাহাড় দিয়ে তরতর করে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে চম্পা। মনোজ তার নাগাল পাচ্ছে না। কিন্তু সে ভাবল পাহাড় থেকে নীচে নামলেই সে চম্পাকে ধরে ফেলবে।

চম্পা এক সময় ঝরনার মধ্যে নেমে পড়ল। এ ঝরনায় মাত্র হাঁটু-জল, তবু চম্পা ওপারে না গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঝরনার মাঝখানে। মনোজ সেই ঝরনার ধারে পৌঁছতেই চম্পা তার দিকে হাতছানি দিয়ে বলল, "আয় মনোজ, আয়, তোকে খাব!"

মনোজ হাত জোড় করে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "রাগ করো না, চম্পা, আমাকে ক্ষমা করো। আমি আর তোমার গায়ে হাত দেব না। তোমার গয়না খুলতে বলব না। তুমি আমার সঙ্গে চলো, তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দেব!"

চম্পা বলল, "না, আমি তোর সঙ্গে যাব না। আমি বাবার কাছে একলাই যেতে পারব!"

এবারে সে ঝরনাটা পার হয়ে আবার ছুটল।

পাহাড় ফুরিয়ে গেলে সমতলেও বেশ খানিকটা জঙ্গল আছে। চম্পা আর মনোজ দু'জনেই নেমে এসেছে সেখানে। মনোজ এবার প্রাণপণে ছুটে কমিয়ে আনল দূরত্ব। এক সময় সে ধরে ফেলল চম্পার শাড়ির আঁচল। চম্পা সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে গিয়ে হাতের দুটো আঙুল বসিয়ে দিল মনোজের চোখে।

তারপর সে হাহা করে হেসে উঠে বলল, "তোকে অন্ধ করে দেব!"

সঙ্গে-সঙ্গে জঙ্গলের রাস্তার বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এল এক জিপগাড়ি। তার হেডলাইটের আলো পড়ল ওদের ওপর। মনোজ একবার মুখ তুলে দেখল জিপগাড়িটা। এটা তার গাড়ি নয়। বুঝতে পেরেই সে চম্পাকে ছেড়ে দিয়ে দৌড় লাগাল পাশের জঙ্গলের মধ্যে।

জিপগাড়িটার সামনের সিটে, ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন কাকাবাবু আর দারুকেশ্বর। পেছনে সন্তু আর জোজো।

দারুকেশ্বর বলল, "ওই তো চম্পা! ওই তো চম্পা!"

কাকাবাবু বললেন, "ওই তো দেবলীনা!"

সন্তু আর জোজো গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে গেল চম্পার দিকে।

সন্তু কখনও দেবলীনাকে শাড়ি-পরা অবস্থায় দ্যাখেনি, তাই প্রথমটা সে চিনতে পারেনি। একেবারে কাছে এসে মুখখানা দেখে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "কাকাবাবু, এই তো দেবলীনা !"

চম্পা সন্তুর বুকে একটা জোরে ধাক্কা দিয়ে বলল, "এই, তুই কে রে ? রাজকুমারীর সামনে জোরে কথা বলছিস ! সরে যা !"

জোজো দেবলীনাকে দ্যাখেইনি, সে বলল, "এই, তোমার সঙ্গে যে লোকটা ছিল, সে গেল কোথায় ? সে তোমার বন্ধু না শত্রু ?"

চম্পা বলল, "চুপ ! কোনও কথা বললে চোখ গেলে দেব ! ওই গাড়িটার আলো নেভাতে বল !"

জিপটা থেমে গেছে। কাকাবাবু আর দারুকেশ্বরও নেমে এগিয়ে এলেন। এখন দারুকেশ্বরের হাতে টর্চ, সে আড়ষ্ট গলায় বলল, "যা ভয় করেছিলুম, তা-ই হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী গুরুদেব আপনাদের দেবলীনা দিদিমণির শরীরের মধ্যে চম্পার আত্মাকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।"

কাকাবাবু সে-কথা গ্রাহ্য করলেন না। এগিয়ে এসে খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, "কী রে, দেবলীনা ? তোর কোনও ক্ষতি হয়নি তো ?"

চম্পা বলল, "তোমাদের এত সাহস, গাড়ি দিয়ে আমার রাস্তা আটকেছ ! সরে যাও, সবাই সরে যাও, আমি এখন কটকে যাব।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, এই-ই তো দেবলীনা। ও এরকমভাবে কথা বলছে কেন ?"

দেবলীনা সন্তুর দিকে ফিরে প্রচণ্ড জোরে ধমক দিয়ে বলল, "চুপ ! কথা বলতে বারণ করেছি না ? এবার তোর গলা আটকে যাবে !"

কাকাবাবু হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বলে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ? চম্পা না দেবলীনা ?"

চম্পা বলল, "আমি রাজকুমারী চম্পা। রাজা রণদুর্মদ ভঞ্জদেও-র মেয়ে। তোমরা এলেবেলে লোক, আমার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?"

সন্তু বলল, "এই, তুই কাকাবাবুর সঙ্গে ওরকমভাবে কথা বলছিস যে ?"

দেবলীনা এবার দুটো হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে বলল, "চোখ গেলে দেব, চোখ গেলে দেব !"

কাকাবাবু সন্তুকে থামতে ইঙ্গিত করে আবার চম্পাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যদি চম্পা হও, তা হলে দেবলীনা কোথায় গেল ? আমরা দেবলীনাকে খুঁজতে এসেছি।"

চম্পা এবার হা-হা-হা-হা করে হেসে উঠল। হাসির দমকে দুলতে লাগল তার শরীর !

গুরুদেবের আশ্রমের দরজাটা ঠেলে ঢুকলেন কাকাবাবু। ভেতরে মশাল জ্বলছে। বাঘছালটার ওপর গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছেন গুরুদেব। তাঁর সবেমাত্র তন্দ্রা এসেছে। তিনি এখনও ঘুমোননি। কাকাবাবুর পায়ের শব্দ পেয়ে তিনি চোখ না খুলেই বললেন, "ওরে ঝমরু, এবার মশালটা নিবিয়ে দিয়ে যা!"

কাকাবাবু বললেন, "ঝমরু এখানে নেই। আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী। সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনার সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে এলাম।"

গুরুদেব তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। কাকাবাবুও ক্রাচ দুটো দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসলেন গুরুদেবের সামনে!

গুরুদেব বললেন, "তুই আবার এখানে এসেছিস? তুই কি এবার মরতে চাস?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "না, সন্ন্যাসীবাবা, আমার মরার জন্য তাড়াহুড়ো কিছু নেই। কোনও এক সময় মরলেই হবে! এখন আপনার সঙ্গে কিছু বলতে চাই।"

গুরুদেব এক হাত উঁচু করে বললেন, "তুই যা, তুই যা! তুই ভুলে যা সব কিছু! ভুলে যা, ভুলে যা।"

কাকাবাবুও একটা হাত উঁচু করে বললেন, "আমি যাব না, আমি যাব না। তুমি সন্ন্যাসী, আমার সব প্রশ্নের উত্তর দেবে। উত্তর দেবে..."

দু'জনেই হাত তুলে পরস্পরের চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। দু'জনেই সম্পূর্ণ মনের জোর নিয়ে এসেছেন চোখে। কেউ কাউকে টলাতে পারলেন না। এক সময় গুরুদেব বললেন, "তুমি কী করতে চাইছ, তা আমি বুঝেছি। শোনো বৎস, দুনিয়ার কারও এমন শক্তি নেই আমাকে সম্মোহিত করতে পারে।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আপনিও আজ আমাকে সম্মোহিত করতে পারেননি, সাধুবাবা! কাল রাত্রে আপনি এমনভাবে আমার সামনে এসে হাজির হলেন, যে আমি তৈরি হবার সুযোগ পাইনি।"

গুরুদেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি এখন খুব ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। আমি চম্পাকে জাগাবার জন্য বহু পরিশ্রম করেছি, নিজের আয়ুক্ষয় করেছি। তাই এখন আমি দুর্বল হয়ে আছি। নইলে, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে আমার কয়েক মুহূর্তের বেশি লাগত না! তা বলে তুমি আমাকে অবশ করতে পারবে না। তোমাকে আমি কিছুই বলব না, তুমি দূর হয়ে যাও! ইচ্ছে হয় তো পুলিশের কাছে যাও!"

কাকাবাবু বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন, "আপনি হঠাৎ পুলিশের কথা বললেন

কেন ? তার মানে আপনি কিছু অন্যায় করেছেন, তা স্বীকার করছেন ? আপনি সাধুবেশে এক পাপী ?”

গুরুদেব জ্বলে উঠে বললেন, “অন্যায় ! তুমি নিমকহারাম ! অকৃতজ্ঞ !”

এবার কাকাবাবুর অবাক হবার পালা। তিনি বললেন, “আমি নিমকহারাম ? আমি অকৃতজ্ঞ ? কার কাছে অকৃতজ্ঞ ? আপনার কাছে ?”

“কাল রাতে জঙ্গলের মধ্যে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বিশ মুহূর্তও স্থির থাকতে পারোনি ! সেই অবস্থায় যদি আমি তোমাকে ফেলে রেখে দিতাম, তোমাকে শেয়ালে-কুকুরে খেয়ে নিত। আমিই মনোজকে বুঝিয়ে, দু'জনে ধরাধরি করে তোমাকে জঙ্গল থেকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসেছিলাম ! কাল ওই জঙ্গলে হায়নার ডাক শোনা গিয়েছিল। আমি না বাঁচিয়ে রাখলে তুমি এখন কোথায় থাকতে ?”

“আপনারাই আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসেছেন ? ধন্যবাদ। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আপনি মানুষ খুন করেন না !”

“আমি মানুষকে মারি না, আমি মানুষকে বাঁচাই ! আমি চম্পাকে বাঁচিয়ে তুলেছি !”

“পনেরো বছর বাদে ? চম্পার দেহ যখন শুধু একটা কঙ্কাল ছাড়া কিছুই নয় ?”

“চম্পা অন্য ঘরে জন্মেছে। আমার টানে সে আবার এখানে চলে এসেছে। সে আসতই। আমি সেই মেয়েটির শরীরে চম্পার আত্মাকে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এখন সে-ই চম্পা !”

“একটি মেয়ের সঙ্গে আর-একটি মেয়ের চেহারার মিল একটা নিছক আকস্মিক ব্যাপার। একজন মরে গেছে অনেকদিন আগে, আর-একজন বেঁচে আছে। এই দু'জনে মিলে এক কি হতে পারে ? অসম্ভব !”

“মূর্খ তুমি কিছুই জানো না। দু'পাতা ইংরেজি পড়ে তোমরা সবজান্তা হয়ে যাও ! তবে শোনো, সব ঘটনা ! ছোট-রানীর ভাইয়ের সাঙ্গোপাঙ্গরা এক রাত্তিরে বীভৎসভাবে খুন করেছিল চম্পাকে। ওই বাড়ির রাজাদের আর কারও মেয়ে ছিল না, চম্পা একমাত্র মেয়ে। ওই বয়েসেই আমার প্রতি চম্পার খুব ভক্তি ছিল, শ্রদ্ধা ছিল। আমি তার মৃত্যু সহ্য করতে পারিনি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাকে বাঁচিয়ে তুলবই। তার দেহটা নিয়ে গিয়ে রেখে দিলাম সুড়ঙ্গের মধ্যে গোপন করে। বহুকাল ওই সুড়ঙ্গের পথ বন্ধ। বড়-রাজা আর আমি ছাড়া ওই সুড়ঙ্গের কথা আর কারও জানা ছিল না। যেখানে বসে আমি দিনের পর দিন শবসাধনা করেছি, আমার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছি। তবু তখন আমি চম্পাকে বাঁচাতে পারিনি। কিন্তু আমি জানতাম, চম্পা একদিন অন্য ঘরে জন্ম নেবেই, আমার টানে সে ঠিকই ছুটে আসবে। সে এসেছে কি না ? আমার প্রতিজ্ঞা সার্থক হয়েছে কি না বলো ? অস্বীকার করতে পারবে ?”

"যে এসেছে, সে চম্পা নয়, সে দেবলীনা। সে তার বাবার সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিল। তার চেহারার সঙ্গে চম্পার চেহারার খানিকটা সাদৃশ্য দেখে ওখানকার কোনও লোক আপনাকে খবর দিয়েছে। তারপর আপনি ওই দেবলীনা নামের মেয়েটিকে সম্মোহিত করেছেন। প্রথমবারই দেবলীনাকে ধরে নিয়ে গেলেন না কেন ? দ্বিতীয়বার সে আমার সঙ্গে না-আসতেও পারত ?"

"ধরে নিয়ে আসব কেন ? তাকে নিজের থেকে আসতে হবে। ওই মেয়েটিকে তো কেউ জোর করে ধরে আনেনি। সে আগের জন্মের চম্পা। তাই সে নিজের থেকে আমার কাছে এসেছে। প্রথমবার সে ফিরে গেলেও আমি নিশ্চিত জানতাম, তাকে আসতেই হবে !"

"সাধুবাবা, আমার মতে এটা কাকতালীয় ছাড়া আর কিছুই না ! আমি দেবলীনাকে নিয়ে এসেছি এবার। আমি তাকে ফিরিয়েও নিয়ে যাব !"

"তুমি পারবে না ! সে এখন পুরোপুরি চম্পা। সে চিনতেই পারবে না তোমাকে। আমাকে আর তার বাবাকে ছাড়া সে আর কাউকেই মানবে না।"

"চম্পার বাবা মেজো-রাজা একা-একা থাকেন। শুনেছি, তিনি অনেকটা পাগলের মতন হয়ে গেছেন। তাঁর ছেলেমেয়ে নেই ! একটি মেয়েকে চম্পা সাজিয়ে তাঁর কাছে পাঠালে তিনি হয়তো তাকেই আঁকড়ে ধরবেন। তারপর সেই বৃদ্ধ রাজার টাকা-পয়সা, সম্পত্তি, সব ওই মেয়েটিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আপনারাই গ্রাস করবেন। এই তো মতলব ?"

গুরুদেব এবারে ঝুঁকে এসে কাকাবাবুর নাকটা চেপে ধরে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "পামর ! তুই এই কথা বললি, তোর এত বড় সাহস ? আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, টাকা-পয়সা ছুঁই না, কোনও কিছু সঞ্চয় করি না, লোকেরা ফল-মিষ্টি দিয়ে গেলে খাই, যেদিন দেয় না, সেদিন কিছুই আহার করি না। তুই আমাকে বললি লোভী ? আজ তোকে এমন শাস্তি দেব..."

বৃদ্ধের আঙুলগুলো লোহার মতন শক্ত। এত জোরে নাক টিপে ধরেছেন যে কাকাবাবু সহজে ছাড়াতে পারলেন না। বাধ্য হয়েই তিনি বৃদ্ধের ঘাড়ে বাঁ হাত দিয়ে জোরে এক কোপ মারলেন।

একটা কাতর শব্দ করে বৃদ্ধ হাত আলগা করে দিলেন।

কাকাবাবু একটু সরে গিয়ে বললেন, "আমার পা খোঁড়া তো, সেইজন্য হাতে জোর বেশি। আপনি শারীরিক শক্তিতে আমার সঙ্গে পারবেন না। আমাকে সম্মোহন করেও বশ করতে পারেননি। বরং আমি আপনাকে যা খুশি শাস্তি দিতে পারি। গুলি করে আপনার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারি। মন দিয়ে আমার কথা শুনুন !"

গুরুদেব বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন কাকাবাবুর দিকে।

কাকাবাবু আবার বললেন, "একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে, আপনি মানুষ খুন করেন না। আপনি আমাকে জঙ্গলে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রাখেননি,

বাঁচিয়েছেন। এটাও বুঝলুম যে, আপনার টাকা-পয়সার প্রতি লোভও নেই। কিন্তু আপনার চ্যালাদের সে-লোভ থাকতে পারে। সে ঠিক আছে, আপনার চ্যালাদের ধরে গারদে পোরা হবে। তবে আপনিও একটা গভীর অন্যায় করেছেন। রাজার মেয়ে চম্পাকে বাঁচাবার জন্য অন্য একজনের মেয়েকে কেড়ে নিয়েছেন। চম্পা না-হয় বেঁচে উঠল, কিন্তু শৈবাল দত্তের মেয়ে দেবলীনা কোথায় গেল ?"

গুরুদেব বললেন, "পৃথিবীতে কত মেয়ে জন্মায়, কত মেয়ে হারিয়ে যায়, তার আমি কী জানি ! সেজন্য আমার কোনও দায়িত্ব নেই। আমার চম্পা ফিরে এসেছে, তাকে আমি পূর্বস্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে !"

"সাধুবাবা, রাজার কাছে তাঁর মেয়ে যেমন প্রিয়, একজন সাধারণ মানুষের কাছেও তো তার মেয়ে সমান প্রিয় ! একজন বাবার কাছ থেকে তার মেয়েকে কেড়ে নিয়ে অন্য একজন বাবাকে ফেরত দেবেন, এ কী রকম কথা ? এটা ঘোর অন্যায় নয় ?"

"তোমার ন্যায়-অন্যায় তোমার কাছে থাক। আমি জানি, চম্পাই আবার জন্মেছে। ও যারই মেয়ে হোক, ও আবার পুরোপুরি চম্পা হয়ে গেছে। আমি তাকে মন্ত্র দিয়েছি, পৃথিবীর আর কোনও শক্তি নেই, ওই মেয়ের দেহ থেকে চম্পাকে বার করে আনতে পারে।"

"ও এরপর থেকে চম্পাই থেকে যাবে ?"

"অবশ্যই ! অবশ্যই ! অবশ্যই ! তোমার পুলিশ, আদালত, যেখানে ইচ্ছে ওকে নিয়ে যাও, ও বরাবর নিজেকে চম্পাই বলবে। চম্পার সব লক্ষণ ওর চেহারায়, স্বভাবে ফুটে থাকবে।"

কাকাবাবুর সারা মুখে এবার হাসি ছড়িয়ে গেল। গুরুদেবের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "সাধুবাবা, বৃদ্ধ হলেই যে মানুষের সব কিছু সম্পর্কে জানা যায়, তা ঠিক নয়। সম্মোহনের শক্তি সারা জীবন তো দূরের কথা, একদিন দু'দিনের বেশি থাকে না। চম্পা হারিয়ে গেছে !"

গুরুদেব বললেন, "তুমি ছাই জানো ! ও-মেয়েকে তুমি যত-খুশি ডাক্তার-বদ্যি দেখাও, ও চম্পাই থাকবে। চম্পা আর কোনও দিন হারিয়ে যাবে না !"

কাকাবাবু গলা তুলে ডাকলেন, "দেবলীনা, দেবলীনা, একবার ভেতরে আয় তো !"

সঙ্গে-সঙ্গে দেবলীনা এসে ভেতরে ঢুকল। তাকে দেখে আবেগকম্পিত গলায় গুরুদেব বললেন, "এই যে মা চম্পা, তুই এসেছিস ? আয়, আমার পাশে বোস !"

দেবলীনা মুচকি হেসে বলল, "গুরুদেব, আমি চম্পা নই। আপনার ঘর থেকে বেরোবার সময় একবার যে আমি আছাড় খেয়ে পড়ে গেলুম, তখনই

আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। আমি বুঝতে পেরে গেলুম, আপনারা আমাকে চম্পা সাজাচ্ছেন। আমি কিন্তু তখন আর আপনাদের বুঝতে দিইনি যে, আমি সব জেনে গেছি! তখন অভিনয় করতে লাগলুম! চম্পার অভিনয় করে আমি মনোজবাবুকে ভয় দেখিয়েছি। কাকাবাবু, সন্তুদেরও ঠকিয়ে দিয়েছিলাম। কাকাবাবু, আমি কেমন অভিনয় করেছি বলুন?"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "একেবারে পাকা অভিনেত্রী! প্রথমটায় আমিও বুঝতে পারিনি।"

গুরুদেবের কপাল কুঁচকে গেছে। তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "তুই চম্পা নোস? এই লোকটা তোকে...চম্পা, চম্পা ফিরে আয় মা..."

কাকাবাবু একটা হাত গুরুদেবের চোখের সামনে ধরে দেবলীনাকে আড়াল করে বললেন, "আপনি আবার ওকে সম্মোহিত করবার চেষ্টা করবেন না। তাতে কোনও লাভ হবে না। আমার কাছে পিস্তল আছে, তার শব্দ করলে এক মুহূর্তে ওর ঘোর কেটে যাবে! আপনি বরং ওকে আশীর্বাদ করুন।"

গুরুদেব আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তুই সত্যি চম্পা নোস?"

দেবলীনা বলল, "না, গুরুদেব। আমি তো কলকাতায় থাকি, আমি দেবলীনা দত্ত। আমার বাবার নাম শৈবাল দত্ত!"

কাকাবাবু বললেন, "যারা মরে যায়, তারা আর ফিরে আসে না। যারা বেঁচে থাকে, তাদেরই ভালবাসতে হয়, স্নেহ-প্রেম দিতে হয়। সাধুবাবা, আপনি ভাল মন নিয়ে ওকে আশীর্বাদ করুন।"

গুরুদেবের চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। তিনি কম্পিত ডান হাতখানা তুলে দেবলীনার মাথার ওপর রেখে বললেন, "সুখী হও মা! চিরায়ুষ্মতী হও!"

তারপরেই গুরুদেব অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ে গেলেন।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললেন, "যাক! দেবলীনা, তুই সাধুর মাথায় একটু জল ছিটিয়ে দে। বুড়ো মানুষ, এতটা মনের চাপ সহ্য করতে পারেনি। একটু সেবা কর, একটু বাদেই জ্ঞান ফিরে আসবে।"

বাইরে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু। সন্তু, জোজো, দারুকেশ্বর সেখানে দাঁড়িয়ে আছে উদগ্রীব হয়ে। কাকাবাবু তাদের বললেন, "সব ঠিক হয়ে গেছে। মনোজটা পালিয়েছে, ওকে ঠিক ধরা যাবে। এই সাধুবাবাকে আর এখান থেকে টানা-হ্যাঁচড়া করার দরকার নেই!"

দারুকেশ্বর বলল, "হ্যাঁ, ওঁকে আর কিছু শাস্তি দেবেন না। বুড়ো মানুষ, ক'দিনই বা আর বাঁচবেন!"

কাকাবাবু সামনের দিকে তাকালেন। সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে আজ। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে জঙ্গল, পাশের ঝরনাটা নেমে গেছে একটা রুপোর পাতের মতন।

কাকাবাবু আপনমনে বললেন, "এখানে বেড়াতে এসে এ-পর্যন্ত কিছুই দেখা হল না, ভাল করে। এবার দেখতে হবে।"

তারপর তিনি সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে, সন্তু, তোরা দু'জনে এখানে হঠাৎ চলে এলি ! তুই বললি, কী দরকারি কথা আছে না ! কী কথা ?"

সন্তু বলল, "কাল রাত্তিরে দিল্লি থেকে নরেন্দ্র ভার্মার স্ত্রী টেলিফোন করেছিলেন। খুবই কান্নাকাটি করছিলেন ভদ্রমহিলা।"

"কেন, কী হয়েছে ?"

"নরেন্দ্র ভার্মাকে চার দিন হল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধেবেলা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথেই তাকে ধরে নিয়ে গেছে। কোনও সন্ধান নেই। ওঁর স্ত্রী বললেন, আপনাকে একবার দিল্লি যেতেই হবে, আপনি না গেলে উনি ভরসা পাবেন না !"

কাকাবাবু ক্লান্তি ও বিরক্তি মিশিয়ে বললেন, "আবার দিল্লি ? আমার কি কিছুতেই ছুটি পাবার উপায় নেই রে, সন্তু ! এখানে এসে দু'চারদিন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করব ভেবেছিলাম..."

এগিয়ে গিয়ে কাকাবাবু ঝরনাটার পাশে বসে পড়লেন। আঁজলা করে জল তুলে মুখে ছেটাতে ছেটাতে বললেন, "আঃ !"